একটি আরাকান গল্প

এক রোহিঙ্গা স্কুলশিক্ষক এবং তার গণহত্যার ডায়েরি

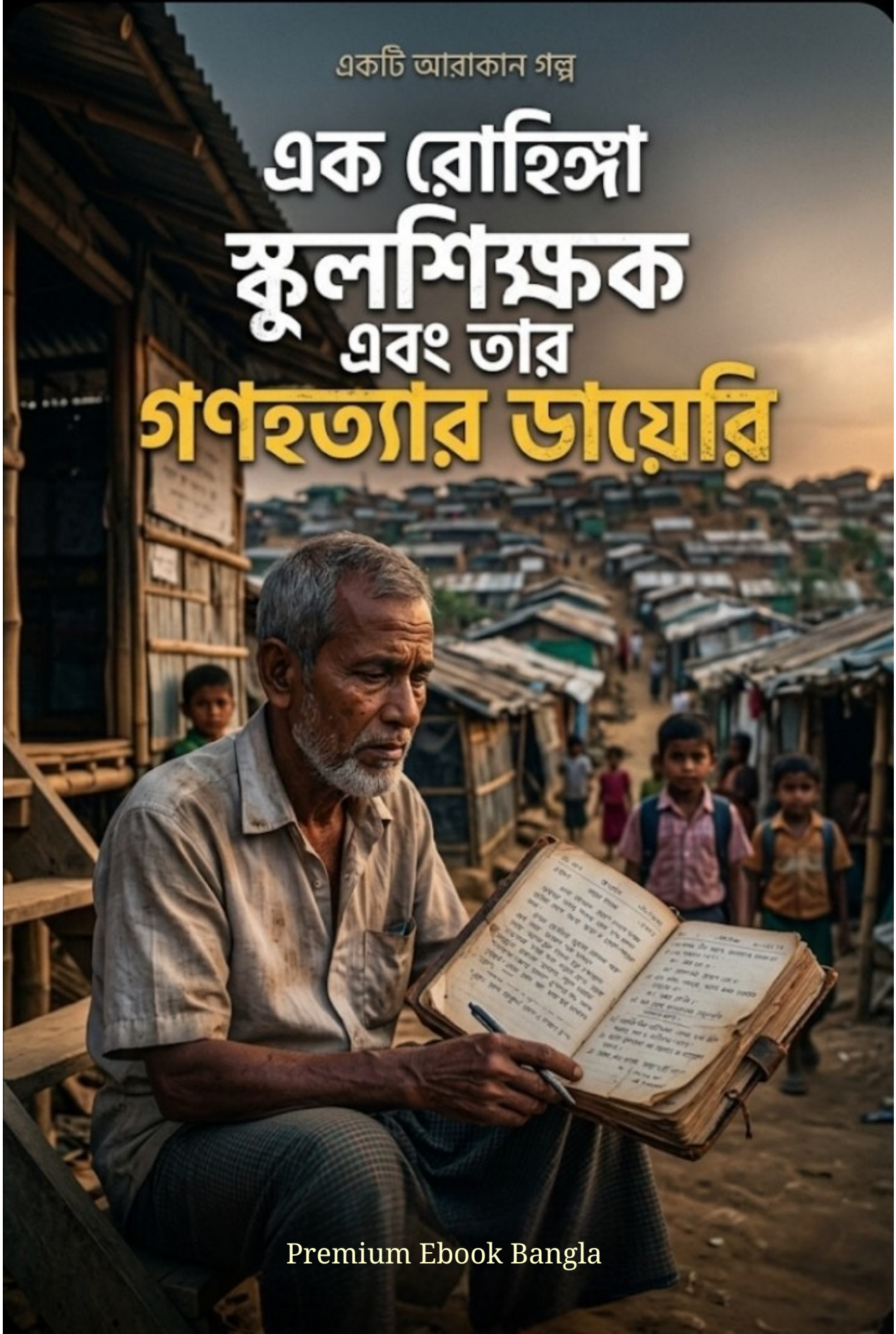

Premium Ebook Bangla

এক রোহিঙ্গা স্কুলশিক্ষক এবং তার গণহত্যার ডায়েরি (১ম পর্ব)

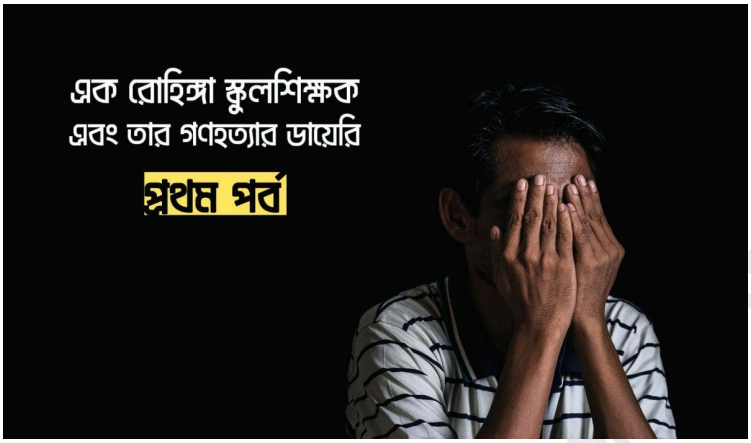

বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থীর মধ্যে একজন ফুতু। তার এবং তার পরিবারের করুণ কাহিনী উঠে এসেছে *দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস* সাময়িকীর Sarah A. Topol-এর The Schoolteacher and the Genocide শিরোনামের একটি সুদীর্ঘ আর্টিকেলে। আমাদের এই সিরিজটি সেই আর্টিকেলেরই অনুবাদ। এটি হচ্ছে সিরিজের প্রথম পর্ব।

নিউ ইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিনে ফুতুকে নিয়ে লেখা আর্টিকেলটি; Image Source: Twitter

ফুতু যখন প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র, তখন তিনি একবার একটি মেয়ের গল্প পড়েছিলেন। মেয়েটি তার বাগানের ফুলগুলোর প্রতিটির ভিন্ন ভিন্ন নাম রেখেছিল। একটি ডায়েরিতে তার ফুলগুলোর নাম লিখে রাখত। কখন সে গাছগুলো লাগিয়েছিল, কখন সেগুলোতে পানি দিত এবং কীভাবে সেগুলো বেড়ে উঠছিল, প্রতিটি ঘটনাই মেয়েটি তার ডায়েরিতে টুকে রাখত।

ফুতু গল্পটি পেয়েছিলেন তাকে দেওয়া তার চাচার একটি বইয়ে, যে বইটি তিনি মায়ানমারের পশ্চিম রাখাইন রাজ্যে অবস্থিত তাদের গ্রামে নিয়ে এসেছিলেন সীমান্তের ওপারের বাংলাদেশ থেকে। বইটির ভাষা ছিল ইংরেজি এবং বাংলা। ফুতু ছিলেন তাদের বর্ধিত পরিবারের মধ্যে স্কুলে যাওয়া প্রথম সন্তান। তার ২২ চাচা, অগণিত চাচী এবং চাচাতো ভাইবোনদের সবার মধ্যে প্রথম। যদিও তিনি বার্মিজ এবং ইংরেজি ক্লাসে ভালো ফলাফল করছিলেন, কিন্তু বইটি তিনি নিজে থেকে বুঝতে পারছিলেন না। তাদের গ্রামের বেশিরভাগ লোকই ছিল নিরক্ষর। ফুতু তাই তাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া ছিল এমন এক ব্যবসায়ীকে অনুরোধ করেছিলেন বইয়ের গল্পগুলো তাকে এক এক পড়ে শোনাতে।

ব্যবসায়ীটির সাথে সাথে ফুতু তার ইংরাজি জ্ঞান অনুশীলন করতে থাকেন। সময়ের সাথে সাথে বইয়ের পৃষ্ঠাগুলো মলিন হয়ে আসতে থাকে, আর ফুতুও নিজে নিজেই বইটি পড়ার যোগ্যতা অর্জন করতে থাকেন। মেয়েটির ধারণাটি ফুতুর খুবই পছন্দ হয়েছিল। তিনি নিজেও মেয়েটির মতো তার প্রতিদিনের কাজকর্মের একটি ডায়েরি রাখতে শুরু করেন। ফুতু তার নিজের সম্প্রদায়ের ভাষা রোহিঙ্গায় লিখতে পারতেন না, কারণ রোহিঙ্গা ভাষার কোনো লিখিত রূপ নেই। তাই তিনি তার ডায়েরিটি লিখতে থাকেন ইংরেজি এবং বার্মিজ ভাষার মিশ্রণে।

বইটিতে ভিন্ন একটি গল্পও উঠে এসেছিল: ফুলের ডায়েরি রাখা মেয়েটি এমন একটি সময়কালের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করছিল, যা ইতিহাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নামে পরিচিত। বইটি পড়ে অবশ্য ফুতুর ধারণা হয়েছিল, এটি ছিল হিটলার এবং ইহুদীদের মধ্যকার একটি যুদ্ধ। ফুল সম্পর্কে মেয়েটির লেখাগুলো তাই একইসাথে পরিণত হয়েছিল সেই সময়ের ঘটনাবলির একটি রেকর্ডে।

ফুতু যখন তার নিজের গ্রামের দিকে তাকান তখন তার কাছে মনে হয়, মেয়েটির এই গল্পটির সাথে তার গ্রামের মুসলিম সম্প্রদায়ের গল্পের বেশ মিল আছে। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, তার উচিত হবে রোহিঙ্গাদের উপর নিপীড়নের ঘটনাগুলো একটি ডায়েরিতে লিখতে শুরু করা। কারণ হয়তো ভবিষ্যতে কোনো দিন কেউ জানতে চাইতে পারে, তাদের সাথে কী ঘটেছে।

বাংলাদেশ, মায়ানমার এবং রাখাইন রাজ্যের মানচিত্র; Image Source: Asia Times

ছোটবেলা থেকেই ফুতু জানতেন, সরকার রোহিঙ্গাদেরকে এই এলাকার অধিবাসী হিসেবে গণ্য করে না। বরং তাদেরকে বিবেচনা করে বাংলাদেশ থেকে আসা অবৈধ অভিবাসী হিসেবে। ফুতু যতদূর জানতেন, তার পরিবারের কেউই বাংলাদেশ থেকে অভিবাসীত হয়ে আসেনি। তাদেরকে কেবল একবার সেখানে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিতে বাধ্য করা হয়েছিল। এটি ঘটেছিল রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অনেকগুলো সশস্ত্র অভিযানের একটির পরে। এরকম সশস্ত্র অভিযান ১৯৪৮ সাল থেকে প্রায় এক ডজনের মতো ঘটেছিল, যদিও ঠিক কতবার ঘটেছিল ফুতুর তা জানা ছিল না।

ফুতু জানতে পেরেছিলেন, মায়ানমারে ১৩৫টি স্বীকৃত জাতিগোষ্ঠী আছে, যাদেরকে বলা হয় তাইং-ইয়িন-থা। অধিকাংশ সময়ই এর অনুবাদ করা হয় 'ন্যাশনাল রেস' তথা 'জাতিগত গোষ্ঠী'

হিসেবে, কিন্তু এর আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে অনেকটা 'ভূমিপুত্র' কিংবা 'আদিবাসী'র মতো। প্রতিবেশী রাখাইন এবং দেশের প্রধান নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী বামারসহ এই ১৩৫টি জাতিগোষ্ঠীর সরকারি স্বীকৃতির পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের অধিকার এবং নাগরিকত্ব ছিল। কিন্তু দশ মিলিয়নেরও বেশি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সেই অধিকার ছিল না।

ফুতু তার চারপাশে দেখা ঘটনাবলি লিখে ফেলতে শুরু করেন। তিনি উল্লেখ করেন, রোহিঙ্গাদেরকে তাদের সকল গবাদিপশু সরকারি খাতায় নিবন্ধন করাতে হতো। বাড়িঘর মেরামত করার জন্য তাদেরকে সরকারের অনুমতি নিতে হতো। এমনকি বিয়ে করার জন্যও তাদেরকে সরকারের কাছে অনুমতি চাইতে হতো। সেই অনুমতি পাওয়ার জন্য তাদেরকে প্রায়ই মোটা অঙ্কের ঘুষ দিতে হতো। এবং তারপরেও অনুমতি পেতে অনেক সময় দুই বছর বা আরো বেশি সময় অপেক্ষা করতে হতো।

রোহিঙ্গারা প্রধান প্রধান কলেজগুলোতে ভর্তি হতে পারত না- আইনজীবী কিংবা ডাক্তার হওয়ার জন্য পড়াশোনা করতে পারত না। তারা সেনাবাহিনী বা পুলিশে যোগদান করতে পারত না, প্রশাসনিক কোনো সংস্থার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারত না এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারত না। তাদেরকে দুটির বেশি সন্তান নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হতো না। মহিলাদেরকে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করতে কিংবা অবৈধ গর্ভপাত ঘটাতে বাধ্য করা হতো। অতিরিক্ত সন্তান পালন করার জন্য তাদেরকে ঘুষ দিতে হতো অথবা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তাদের সন্তানদেরকে লুকিয়ে রাখতে হতো।

সময়ের সাথে সাথে প্রায় প্রতিটি রোহিঙ্গার কাছ থেকে তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ চাওয়ামাত্রই রোহিঙ্গারা তাদেরকে নিজেদের গরু এবং মুরগি দিয়ে দিতে বাধ্য হতো। কোনো মজুরি কিংবা ক্ষতিপূরণ ছাড়াই তাদেরকে মোটরসাইকেল ধার দিতে কিংবা তাদের জন্য শারীরিক পরিশ্রম করতে রোহিঙ্গাদেরকে বাধ্য করা হতো।

অনেক চিকিৎসক রোহিঙ্গাদের চিকিৎসা করতে অস্বীকৃতি জানাত। হাসপাতালে যাওয়ার জন্য এত বেশি অনুমতিপত্র এবং সময় লাগত যে, অধিকাংশ সময়ই অর্ধমৃত অবস্থায় সেখানে পৌঁছানোর পর বিনাচিকিৎসায় তারা মারা যেত। রোহিঙ্গা পরিবারগুলো হাসপাতালকেই দোষারোপ করত- তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল, তাদেরকে মেরে ফেলার লক্ষ্যেই চিকিৎসকরা তাদেরকে অবহেলা করত। অনেকেই হাসপাতালে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। তারা এমন সব কারণে মারা যেতে শুরু করেছিল, যেগুলো সহজেই প্রতিরোধযোগ্য ছিল।

ফুতু জানতেন না, মায়ানমারের সরকার কেন রোহিঙ্গাদের প্রতি এ ধরনের বর্বর আচরণ করত। তিনি শুধু জানতেন, তারা ছিলেন সেখানে অবাঞ্ছিত। একদিকে বার্মিজ সরকার তাদেরকে দাবি করত বাংলাদেশি বলে, অন্যদিকে বাংলাদেশ সরকার দাবি করত বার্মিজ বলে। রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মনের মধ্যে সর্বদা এই প্রশ্নটিই জাগত: কোন যুক্তিতে আমরা এই অঞ্চলের ভূমিপুত্র না? আমরা কি তবে আকাশ থেকে পড়েছি?

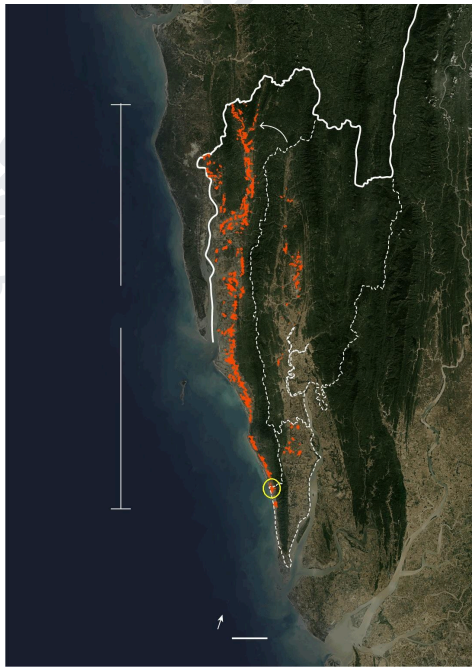

পুড়িয়ে দেওয়া রোহিঙ্গা গ্রামগুলো, গোল চিহ্নিত গ্রামটি দুনসে পাড়া; Image Source: Weiyi Cai and Simon Scarr @ REUTERS GRAPHICS

নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে ফুতু যখন তার গ্রামের কাহিনী লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তখন তার তেমন কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না। তিনি শুধু তার সম্প্রদায়, তার পরিবার এবং প্রতিবেশীদের সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। তিনি পৃথিবীর বুকে তাদের শেকড়ের সন্ধান খুঁজে বের করতে চেয়েছিলেন।

বার্মিজ ভাষায় তাদের গ্রামটির নাম ছিল কোয়ে তান কাউক, কিন্তু তাদের কাছে এর পরিচিতি ছিল দুনসে পাড়া নামে। গ্রামটি ছিল এক চিলতে সবুজ সমতল ভূমির উপর অবস্থিত। এর একপাশে ছিল ধূসর বঙ্গোপসাগর এবং অপরপাশে ছিল পাথুরে মায়ু পর্বতমালা। প্রতিদিন ভোরে অন্ধকার থাকতেই গ্রামের পুরুষরা ঘুম থেকে জেগে উঠত। সমুদ্রের তীর ধরে পায়ে হেঁটে তারা উপস্থিত হতো সারি বাঁধা নৌকার কাছে। এরপর সেগুলোতে চড়ে মাঝসমুদ্রে বেরিয়ে পড়ত মাছ ধরার উদ্দেশ্যে।

নৌকাগুলোর মধ্যে ছিল কাঠের তৈরি অনেকগুলো দাঁড় টানা ছোট নৌকা এবং সেই সাথে ২২টি মোটরচালিত বড় জাহাজ। সবগুলো নৌকার মালিকানা ছিল অল্প কিছু ধনী গ্রামবাসীর হাতে, যারা শ্রমিকদেরকে মাঝসমুদ্রে পাঠানোর জন্য দিনচুক্তিতে ভাড়া করত। মাছ ধরার বাইরে বাকি সময়টুকুতে গ্রামের পুরুষরা ধান এবং মরিচ চাষ করত। তারা তাদের গবাদিপশুর যত্ন নিত। তাদের সমাজ ছিল বেশ রক্ষণশীল। মহিলারা সাধারণত ঘরের ভেতরেই থাকত। বার্মিজ পুরুষদের নজর এবং হাতের নাগালের বাইরে, যারা তাদেরকে প্রায়ই হেনস্থা করত।

ফুতু তার দাদার কাছে এবং গ্রামের প্রবীণদের কাছে দুনসে পাড়া গ্রামের গোড়াপত্তন সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। তার দাদা ব্যাখ্যা করেছিলেন, তাদের পূর্বপুরুষদের বসবাস ছিল নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের গায়ে, যেখানে গ্রামের লোকেরা এখন মেষ চরাতে যায়। ফুতুর দাদার দাদা তার পারিবারিক জমির একটি অংশ দান করে দিয়েছিলেন একটি কবরস্থান নির্মাণের জন্য। কিন্তু কবরস্থানটি নির্মিত হওয়ার পর থেকে পাহাড়ের অধিবাসীদের মধ্যে রোগ-জীবাণু ছড়িয়ে পড়তে

শুরু করে। ফলে তারা পাহাড় ছেড়ে পালিয়ে এসে নিচের একটি গ্রামে বসতি স্থাপন করেন, যে গ্রামটিকে তারা বলতেন 'পাহাড়ের নিচের গ্রাম'।

পাহাড়ের নিচের গ্রামের জনসংখ্যা যখন বাড়তে শুরু করে, তখন ধীরে ধীরে তারা সমুদ্রের উপকূলের দিকে সরে যেতে থাকেন। সেখানে তারা প্রথমে প্রতিষ্ঠা করেন 'বড় গ্রাম', এরপর 'সমুদ্রতীরের গ্রাম', এবং সবশেষে 'সমুদ্রতীরে স্থানান্তরিত বড় গ্রাম'। এই শেষোক্ত গ্রামেই ফুতু এবং তার পরিবার বসবাস করতেন। দুনসে পাড়া গ্রামটি মূলত এই চারটি অপেক্ষাকৃত ছোট গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত। বনের মধ্য দিয়ে সোজা চলে যাওয়া সুপরিকল্পিত একটি রাস্তার দুই পাশে সারিবদ্ধভাবে অবস্থিত প্রায় ১,০০০টি বাড়ি দ্বারা গ্রামটি সুসজ্জিত।

দুনসে পাড়ার সবচেয়ে নিকটবর্তী রাখাইন বসতটির অবস্থান গ্রামটি থেকে মাত্র ১ মাইল দূরে। সেখানে প্রায় ১০০টি রাখাইন পরিবার বসবাস করত। সেটিও কোয়ে তান কাউক নামেই পরিচিত। দুই বসতির মাঝামাঝি স্থানে একটি নিরাপত্তা চৌকি ছিল। ফুতু যতটুকু নিশ্চিত করতে পেরেছেন, রাখাইনরা যেখানে বাস করত, সেই এলাকাটুকুও প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে রোহিঙ্গাদেরই সম্পত্তি ছিল।

জমির ইতিহাস নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার পর ফুতু নজর দেন তাদের সম্প্রদায়ের মানুষের ইতিহাসের দিকে। গ্রামের পরিবারগুলোর ফ্যামিলি ট্রি অঙ্কন করার জন্য তিনি তার দাদা এবং গ্রামের প্রবীণদের কাছে ফিরে যান। তিনি গ্রামের মানুষদের নাম এবং জন্মস্থান খুঁজে বের করে তালিকাভুক্ত করতে শুরু করেন: মায়েদের গ্রাম, বাবাদের গ্রাম, তাদের ভাইবোনদের গ্রাম, সবার সন্তানদের নাম– যতক্ষণ পর্যন্ত না তার তালিকা একাধিক গ্রাম জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।

ফুতু আবিষ্কার করেন, একই গ্রামে বসবাস করা অনেকেই একে অপরের সাথে রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত, যদিও তারা নিজেরাই তা জানত না। আবার এমন অনেক মানুষ ছিল, যাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্কে ছিল ঠিকই, কিন্তু তারা যেরকম মনে করত, সেরকম না। ফুতু নিজেই ছিলেন

এরকম একজন। যে মেয়েটিকে তিনি বোন বলে জানতেন, তিনি ছিলেন আসলে তার কাজিন। মেয়েটির বাবার দাদী এবং ফুতুর মায়ের নানী ছিলেন একে অপরের বোন।

ফুতু ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বসবাস করা এমন অনেককেও খুঁজে পেয়েছিলেন, যারা আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও একে অপরকে চিনত না। ফুতু এক একটি ছোট পরিবারের রক্তের ধারা অনুসরণ করে তার অনুসন্ধান কার্যক্রম চালিয়ে যেতেন যতক্ষণ পর্যন্ত না সেটি পাহাড়ের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠা লতাপাতার মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত।

দুনসে পাড়ার বাসিন্দারা ফুতুর এই অনুসন্ধান কার্যক্রমের অর্থ বুঝতে পারত না। তারা তাকে জিজ্ঞেস করত, কেন তিনি সবকিছু লিখে রাখেন? এটা কি কোনো ধরনের জাদুটোনা? কিন্তু যখন তাদের কোনো প্রশ্নের উত্তর জানার প্রয়োজন হতো, কার সাথে কার কী সম্পর্ক, তখন তারা ঠিকই ছুটে আসত ফুতুর কাছে।

ধীরে ধীরে ফুতুর নোটবুকগুলো ভরাট হয়ে উঠতে থাকে, সেগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে, ছোট ছোট তথ্যগুলো পরিণত হতে থাকে প্রামাণ্য দলিলের বিশাল একটি জালে- পৃথিবীর বুকে এর সন্তানদের শেকড়ের, তাদের মালিকানার, তাদের অধিকারের প্রামাণ্য দলিলের জালে।

এক রোহিঙ্গা স্কুলশিক্ষক এবং তার গণহত্যার ডায়েরি (২য় পর্ব)

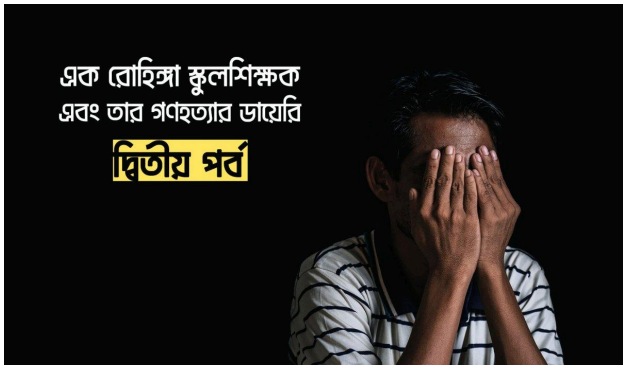

এক রোহিঙ্গা স্কুলশিক্ষক এবং তার গণহত্যার ডায়েরি

দুনসে পাড়ায় এমন কোনো বই ছিল না, যা থেকে ফুতু জানতে পারতেন যে, বহির্বিশ্বের মানুষেরা সেই অষ্টাদশ শতকেই এই অঞ্চলে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের উপস্থিতি নথিভুক্ত করেছিল। ১৭৯৯ সালে ফ্রান্সিস বিউক্যান্যান নামে ভারতে বসবাসরত এক স্কটিশ চিকিৎসক তৎকালীন আরাকান ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, সেখানে দুটি সম্প্রদায় বসবাস করত: 'ইয়াকাইন' এবং 'রুইঙ্গা'। (তার এই রেকর্ডটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিটিশদের আগমনের পূর্বে কারা বার্মায় ছিল বা ছিল না, এবং এর ফলে কারা এই অঞ্চলের ভূমিপুত্র বা ভূমিপুত্র না, এই বিষয়ক বিতর্কে রেকর্ডটির কথা প্রায়ই উঠে আসে।)

ফুতু জানতেন, ব্রিটিশরা ১৮২৪ সাল থেকে রাখাইন রাজ্যের বর্তমান অঞ্চলটির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেছিল। কিন্তু তিনি এটা জানতেন না যে, বার্মার বাকি অংশের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে তাদের ছয় দশক সময় লেগে গিয়েছিল। বার্মা ছিল তৎকালীন ভারতবর্ষের একটি প্রদেশ। দুই দেশের সীমান্ত ছিল উন্মুক্ত। সে সময় ভারতের মধ্যে বর্তমান পাকিস্তান এবং বাংলাদেশও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ব্রিটিশরা ভারত থেকে বার্মায় অভিবাসনকে উৎসাহিত করত। তারা নবাগত মুসলমানদেরকে আকর্ষণীয় উচ্চপদ দিয়ে পুরস্কৃত করত, যা স্থানীয়দের মধ্যে ঈর্ষা এবং হতাশার জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমৃদ্ধি ও শান্তির সময়কাল হিসেবে সমাজের অনেকেই ঔপনিবেশিক আমলের কথাই স্মরণ করে।

ফুতুর দাদা তাকে জানিয়েছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালে জাপানিরা যখন আরাকান আক্রমণ করে এবং পাহাড়ের উপর ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে, তখন সেই যুদ্ধ দুনসে পাড়ার লোকদেরকে স্পর্শ করেনি। কিন্তু বাস্তবে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর রোহিঙ্গা এবং রাখাইনরা পরস্পরের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। এই সাম্প্রদায়িক বিরোধই পরবর্তীতে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে প্রতিধ্বনিত হয়।

বৌদ্ধ রাখাইনরা আক্রমণকারী জাপানিদেরকে সমর্থন করে, কারণ তারা ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা এনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। অন্যদিকে মুসলিম রোহিঙ্গারা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদেরকে সমর্থন করে, কারণ তারা তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করেছিল। ফুতুর দাদা কেবল তাকে জানিয়েছিলেন, বিশ্বযুদ্ধের সময় উভয় সম্প্রদায় লম্বা ছুরি এবং পাথর নিয়ে একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

ফুতুর পরিবারের মতো অনেক রোহিঙ্গা পরিবার আত্মরক্ষার জন্য রাজ্যের উত্তরে পালিয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে রাখাইনরা তাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য রাজ্যের দক্ষিণে জমায়েত হয়েছিল। ফুতুর দাদার দাদী সে সময় এতই বৃদ্ধ ছিলেন যে, দ্রুত ছুটতে না পারার কারণে প্রতিপক্ষের ছুরির আঘাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন।

এক মাস উত্তরে অবস্থান করার পর যখন ফুতুর দাদারা ঘরে ফিরে আসেন, তখন তাদের বাড়িঘর ছিল বিধ্বস্ত। তাদের গরুগুলোও গায়েব হয়ে গিয়েছিল। এটি ছিল সাম্প্রতিক ইতিহাসের অনেকগুলো সহিংস সংঘাতের মধ্যে প্রথমটি। এই সংঘাতগুলোর প্রতিটির উৎস ছিল স্বতন্ত্র, কিন্তু সবগুলোই ছিল স্থানচ্যুতি এবং প্রত্যাবর্তনের এক নির্মম পুনরাবৃত্তি।

জীবন বাঁচানোর জন্য পালাচ্ছে রোহিঙ্গারা; Image Source: Mohammad Ponir Hossain/Reuters

১৯৪৮ সালে বার্মার স্বাধীনতার প্রাক্কালে দেশটিতে ভারতবিরোধী এবং মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিল। দাঙ্গাকারীদের দাবি ছিল, যারা ব্রিটিশদের সাথে এসেছিল তাদেরকে ব্রিটিশদের সাথেই ফিরে যেতে হবে। সে সময় অনেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে, যা এখন বাংলাদেশ নামে পরিচিত, সেখানে পালিয়ে গিয়েছিল।

১৯৫০-এর দশকে, বার্মার প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ইউ নুর সরকার ঘোষণা করেছিল, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের আগমনের পূর্বে থেকেই যারা বার্মার সীমান্তের মধ্যে বসবাস করে আসছিল, তাদেরকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। সে সময় ফুতুদের পরিবারের মতো অনেক রোহিঙ্গা পরিবারকে কাগজপত্র দেওয়া হয়েছিল। তাদেরকে ভবিষ্যৎ স্বায়ত্তশাসনসহ বিভিন্ন অধিকারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু ১৯৬২ সালে জেনারেল নে উইনের অভ্যুত্থান এই পরিকল্পনাগুলো বন্ধ করে দেয়। নে উইন বিশ্বাস করতেন, রাষ্ট্রের পরিচয় হতে হবে বৌদ্ধ। জাতীয় সংহতির স্বার্থে তিনি অধিকারের জন্য আন্দোলনরত সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীগুলোকে দমন করার পক্ষে ছিলেন। তার ক্ষোভ ছিল বিশেষভাবে মুসলমানদের প্রতি, যাদেরকে তিনি প্রতিস্থাপিত জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করতেন। তিনি আশঙ্কা করতেন, মুসলমানরা অধিকসংখ্যক সন্তানের জন্ম দিয়ে জনসংখ্যা তাদের পক্ষে পরিবর্তন করে ফেলবে।

সামরিক জান্তা রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের ভ্রমণের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। তারা নতুন নির্দেশাবলী কার্যকর করার দায়িত্ব তুলে দেয় বৌদ্ধ রাখাইনদের হাতে। ১৯৬৩ সালে ফুতুর দাদাসহ অনেক রোহিঙ্গা পালিয়ে গিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। ফুতুর দাদা সেই দিনগুলোর কথা খুব কমই বলতেন, কিন্তু ফুতু জানতেন নির্বাসনের সেই দিনগুলোতেই তিনি বাংলা পড়তে শিখেছিলেন। ফুতু যখন খুব ছোট ছিলেন, তখন প্রায়ই মাগরিবের নামাজের পর তিনি তার দাদাকে গানের মতো সুর করে দীর্ঘ বাংলা কবিতা পড়তে দেখতেন। গ্রামের লোকেরা এসে তার কবিতা আবৃত্তি শুনত, পুনরায় আবৃত্তি করার জন্য অনুরোধ করত।

১৯৭৭ সালের শুরুতে বার্মিজ সেনাবাহিনী, যারা 'তাতমাদাও' নামে পরিচিত, তারা বিশাল একটি অভিযান পরিচালনা করে। 'নাগা মিন' তথা 'ড্রাগন কিং' নামের ঐ অভিযানের লক্ষ্য ছিল 'অবৈধ অভিবাসীদের' বার্মা থেকে বিতাড়িত করা। একদিন তাতমাদাও ফুতুদের গ্রামেও প্রবেশ করে। তারা ফুতুর বাবা-মা-সহ গ্রামের লোকজনকে এক জায়গায় একত্রিত করে এবং তাদের জামার হাতা উপরে উঠিয়ে টিকার দাগ দেখাতে বাধ্য করে। তাদের দাবি, বাংলাদেশিদের টিকার দাগ থাকে ডান বাহুতে, আর বার্মার নাগরিকদের থাকে বাম বাহুতে।

এই আতঙ্কজনক অভিযানের সময় রোহিঙ্গাদের কাছ থেকে তাদের নাগরিকত্বের কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। সৈন্যরা গ্রামগুলো পুড়িয়ে দেয়, মসজিদগুলো ধ্বংস করে দেয় এবং জনগণকে খুঁটির বেড়া দিয়ে তৈরি আবদ্ধ জায়গায় স্থানান্তরিত করে। তারা পুরুষদেরকে খুন এবং নারীদেরকে ধর্ষণ করে। দুই লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশ এবং বার্মাকে পৃথককারী নাফ নদীর অপর পাড়ে বাংলাদেশের জীর্ণ শিবিরগুলোতে গিয়ে ভিড় করে।

বাংলাদেশী কর্তৃপক্ষ রোহিঙ্গাদের বোঝা বহন করতে আগ্রহী ছিল না। তারা রোহিঙ্গাদেরকে ফিরে যেতে বাধ্য করার লক্ষ্যে খাবারের রেশন আটকে রাখে। বার্মা ছেড়ে পালানোর ছয় মাসেরও কম সময়ের মধ্যে রোহিঙ্গাদেরকে জোর করে দেশে ফেরত পাঠানো হয়। এর তিন বছর পর বার্মার সামরিক সরকার ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইন পাশ করে। আইনটি রোহিঙ্গাদেরকে নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করার কাজে ব্যবহৃত হয়। রোহিঙ্গারা পরিণত হয় একটি দেশের মধ্যে থাকা বিশ্বের বৃহত্তম রাষ্ট্রবিহীন জনসংখ্যায়।

বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের একটি শরণার্থী শিবির; Image Source: MAHMUD HOSSAIN OPU/AL JAZEERA

১৯৯২ সালে ফুতুদের পরিবার যখন আবারও কয়েক হাজার রোহিঙ্গার সাথে যোগ দিয়ে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে হাঁটতে শুরু করে, তখন ফুতু সবেমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। তারা পালাচ্ছিলেন রোহিঙ্গাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করার জন্য শুরু হওয়া একটি নতুন অভিযানের হাত থেকে বাঁচতে, যে অভিযানের তালিকায় ফুতুর বাবার নামও ছিল। তাদের আগে পালানো রোহিঙ্গাদের দ্বারা সৃষ্ট পথ ধরে টানা ছয় দিন হাঁটার পর অবশেষে তারা বাংলাদেশে গিয়ে পৌঁছেন।

সেবার সর্বমোট ২ লাখ ৭০ হাজার মানুষ বাংলাদেশে গিয়ে আশ্রয় নেয়। চার বছর পর্যন্ত তাদেরকে বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরে অবস্থান করতে হয়। এই সময়ের মধ্যে তাদের অজান্তে বার্মিজ সরকার তাদের এলাকায় ‘মডেল’ বৌদ্ধ গ্রাম নির্মাণের একটি প্রকল্প শুরু করে। তারা দেশের

অন্যান্য অঞ্চল থেকে দরিদ্র রাখাইন এবং বামার বন্দীদেরকে বিশাল জমি, এক জোড়া বলদ এবং একটি বাড়ি প্রদানের বিনিময়ে সেখানে প্রতিস্থাপন করার জন্য নিয়ে আসে।

শরণার্থী শিবিরে গিয়েও ফুতুর বাবা তার সন্তানের পড়াশোনার আশা ছেড়ে দেননি। অব্যবহৃত একটি কুটিরে তিনি ফুতুর জন্য প্রাইভেট একটি ক্লাসের ব্যবস্থা করেন। সেখানে ছোট একটি দলের সাথে অন্য এক রোহিঙ্গা শরণার্থীর কাছ থেকে ফুতু ইংরেজি এবং বার্মিজ ভাষা শেখেন।

এক সকালে ফুতুদের পরিবারকে জানানো হয়, পরদিন তাদেরকে মায়ানমারে ফিরে যেতে হবে। তাদের কিছু করার ছিল না। যেসব শরণার্থী প্রতিবাদ করেছিল, তাদেরকে মারধর করা হয়। কয়েকজন মারাও যায়। পরদিন সকালে তাদের পরিবারকে একটি স্পিডবোটে করে নামিয়ে দেওয়া হয় এমন একটি ভূমিতে, যেখানে তাদেরকে কেউ চায় না।

উপকূলে পা রাখার পর ফুতুর মা যখন তাতমাদাও এবং রাখাইনদেরকে দেখেন, তখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাদের বাড়ির কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। পাহাড় থেকে কাঠ সংগ্রহ করা থেকে নিয়ে তাদেরকে সবকিছু আবার শূন্য থেকে শুরু করতে হয়েছিল।

প্রাইমারি স্কুল শেষ করার জন্য ফুতু প্রতিদিন হেঁটে হেঁটে পার্শ্ববর্তী রাখাইন গ্রামে যেতেন। এরপর মিডল স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য তিনি পাশের একটি রাখাইন শহরে পাড়ি জমান। কিন্তু তাদের মনের মধ্যে যে ভয় ঢুকে গিয়েছিল, সেটা কখনোই কাটেনি। বিভিন্নভাবে সেটা নিজের উপস্থিতি জাহির করত। প্রত্যেক বার সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি টের পাওয়ামাত্রই ফুতুর বাবা আতঙ্কিত হয়ে পড়তেন। তার শরীর কাঁপতে থাকত, তিনি বিচলিত হয়ে পড়তেন, যদিও ফুতু তখনও তেমন কোনো বিপদের আশঙ্কা দেখতেন না।

সবগুলো ঘটনার তারিখ এবং বিস্তারিত বিবরণ ইতিহাসে ঠাঁই না পেলেও মানুষের ট্রমা ঠিকই পরবর্তী প্রজন্মের কাছে স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। শিশুরা এটা আয়ত্ত করেছিল তাদের জন্য উদ্বিগ্ন মায়েদের আলিঙ্গন কিংবা বাবাদের ক্রোধের মধ্য দিয়ে। এটা উপস্থিত ছিল টহলদার

বাহিনীকে আসতে দেখে তাদের বাবাদের শিউরে উঠার মধ্যে, কিংবা নিরাপত্তাবাহিনীর ভয়ে গ্রামের মানুষদের পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে, রাতের পর রাত পাহাড়ের বুকে অতিবাহিত করার মধ্যে।

নির্মূলীকরণ ছাড়াই রোহিঙ্গারা বিলীন হয়ে যাচ্ছিল, শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যতের স্বপ্ন ধারণ করতে তারা অক্ষম হয়ে পড়ছিল। তাদের অনেকে সুন্দর বাড়ি তৈরি করতে আগ্রহী হতো না। আবার অনেকে এমন জমিতে বিনিয়োগ করত, যে জমি তাদেরকে চাইত না। একে একে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে, তাদের বেঁচে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। তারা বড় হয়ে উঠছিল তাদের বাবা-মায়েদের ট্রমাগুলো নিজেরা বহন করে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। তারা এগুলোর উৎসও জানত না, কিংবা আবার কখন নতুন কিছু একটা এসে তাদেরকে জোরপূর্বক তাদের পৃথিবী ছুঁড়ে ফেলে দিবে, সেটাও জানত না।

এক রোহিঙ্গা স্কুলশিক্ষক এবং তার গণহত্যার ডায়েরি (৩য় পর্ব)

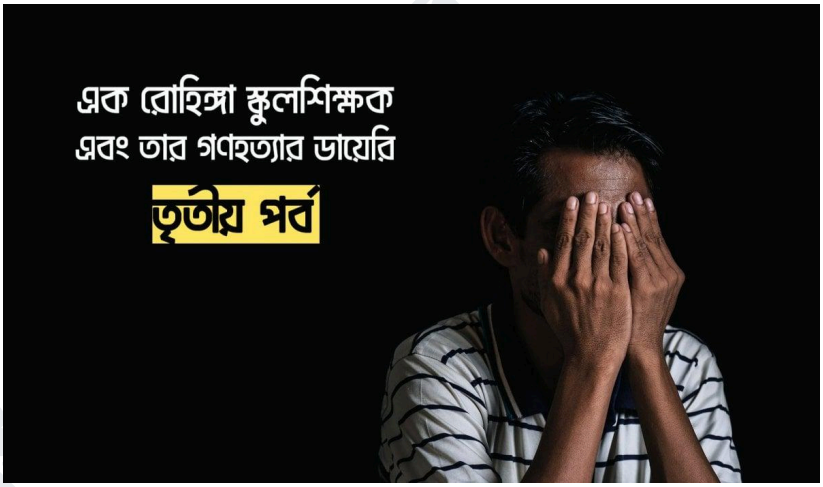

ফুতুর বাবার কাছে ছেলেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানোর মতো যথেষ্ট টাকা ছিল না। রাখাইন রাজ্যে পড়াশোনা ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল- এক বছর হাই স্কুলে পড়ার খরচ ছিল ১.৮ মিলিয়ন থেকে ২ মিলিয়ন কায়াত (প্রায় ১,২৫০ মার্কিন ডলার)। অধিকাংশ পরিবারের পক্ষে মাত্র এক সন্তানকে পড়াশোনা করানো সম্ভব হতো, যদি তাদের অন্য সবগুলো ছেলে মিলে অর্থ উপার্জন করত।

হাই স্কুল শেষ করার পর ফুতু আরেকটি জার্নাল রাখতে শুরু করেন, লাল রঙের ছোট একটি নোটবুক। এতে তিনি নিকটবর্তী ফাঁড়ি থেকে তাদের গ্রামে আসা সীমান্তরক্ষী বাহিনী নাসাকার দ্বারা সংঘটিত ঘুষ, চাঁদাবাজি, মারধর, জরিমানা এবং গ্রেপ্তারের ঘটনাগুলো নথিভুক্ত করতে শুরু করেন। ফুতুর বাবা তাকে ছোট একটি দোকান দেওয়ার জন্য টাকা ধার দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কিন্তু ফুতুর ইচ্ছে ছিল তারচেয়েও বড় কিছু করার।

ফুতুর এক বন্ধু, যে সকাল বেলা মাদ্রাসায় এবং বিকেল বেলা মসজিদে শিক্ষকতা করত, সে ফুতুকে দিনের বেলা ছেলেমেয়েদেরকে ইংরেজি এবং বার্মিজ পড়ানোর জন্য একটি ছোট ক্লাস খোলার পরামর্শ দিয়েছিল। বন্ধুটি বলেছিল, এমন অনেক শিশু পাওয়া যাবে, যারা পড়াশোনা শিখতে আগ্রহী।

বন্ধুটির সাথে মিলে ফুতু দুই ডজন ছাত্র সংগ্রহ করেন। তিনি তাদের বাসায় গিয়ে তাদের বাবা-মায়েদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করেন, তাদের উচিত পাঠ্যপুস্তক কেনার জন্য অর্থ সঞ্চয় করা। যেসব পরিবার টাকা জোগাড় করতে পারছিল না, তাদের জন্য ফুতু ধনী ব্যক্তিদের কাছে ধর্না দেন অনুদানের জন্য। সেগুলোও যখন পর্যাপ্ত হচ্ছিল না, তখন তিনি নিজেই পকেট থেকে টাকা দিয়ে ছাত্রদেরকে বই কিনে দেন।

বিশ্বকে আরো ভালোভাবে জানার জন্য ফুতু মংডু থেকে সাপ্তাহিক পত্রিকা এনে দেওয়ার জন্য ভ্রমণকারী ব্যবসায়ীদের সাথে চুক্তি করেন। তিনি ইতিহাস এবং সাহিত্য পছন্দ করতেন। ইংরেজি গান শুনে শুনে সেগুলোর লিরিক লেখার ব্যাপারে তার প্রচণ্ড উৎসাহ ছিল। তিনি বই সংগ্রহ করতে শুরু করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, উইনস্টন চার্চিল এবং বিল ক্লিনটন সম্পর্কে তিনি পড়াশোনা করেন। তিনি তার ছাত্রদেরকে গান গেয়ে এবং কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন যেন তারা সেগুলো সহজে মনে রাখতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের বোঝার সুবিধার জন্য তিনি বার্মিজ পাঠ্যক্রম রোহিঙ্গা ভাষায় অনুবাদ করেন। তার নোটবুকের ইতিহাসের মতো, প্রতিটি বিষয় তিনি ব্যাখ্যা করতেন একেবারে গোড়া থেকে।

কয়েক মাসের মধ্যেই ফুতুর শিক্ষার্থীরা পড়তে এবং লিখতে শুরু করে। দুই বছরের মধ্যে তারা মিডল স্কুল পরীক্ষা পাস করতে শুরু করে। রোহিঙ্গা ছেলেমেয়েরা যখন তাদের রাখাইন সহপাঠীদের চেয়েও ভালো নম্বর পেতে শুরু করে, তখন পার্শ্ববর্তী রাখাইন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকরা অবাক হয়ে যান। তারা অবিশ্বাসের সাথে তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা পড়ালেখা শিখেছ কীভাবে?

২০১০ সালের নির্বাচন পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের ভোটাধিকার ছিল। সে সময় সেনাবাহিনীর সাথে সম্পর্কিত ইউনিয়ন সলিডারিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির (ইউএসডিপি) প্রার্থী দুনসে পাড়ায় একটি নির্বাচনী প্রচারণার আয়োজন করেছিলেন। রাজনৈতিক সংস্কারের লক্ষ্যে ২০০৭ সাল থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নেতৃত্বে সংঘটিত সরকারবিরোধী ধারাবাহিক বিক্ষোভ 'স্যাফরন বিপ্লব'-এর পর ঐ সময় সামরিক জান্তা তাদের নিয়ন্ত্রণ কিছুটা শিথিল করেছিল। কিন্তু নোবেল শান্তি পুরষ্কার বিজয়ী অং সান সু চির নেতৃত্বাধীন দল ঐ নির্বাচন বর্জন করেছিল এবং আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা নির্বাচনটিকে অ-নিরপেক্ষ বলে নিন্দা জানিয়েছিল।

কিন্তু দুনসে পাড়ায় ইউএসডিপি রোহিঙ্গাদেরকে তাদের ভোটের বিনিময়ে বিভিন্ন অধিকারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তারা স্থানীয় উন্নয়নের জন্য সাত মিলিয়ন কায়াত দেওয়ার প্রস্তাব করেছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে এই টাকা ভাগ করে দিলে প্রতিটি পরিবারের পক্ষে এক কাপ চায়ের বেশি কিছু কেনা সম্ভব হতো না। ফুতু তাই প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সরাসরি স্থানীয় জনগণের মধ্যে বিতরণ করার পরিবর্তে এই টাকা দিয়ে তাদের একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা উচিত। তখন পর্যন্ত যেসব রোহিঙ্গা শিক্ষার্থী নিবন্ধিত কোনো প্রাইমারি স্কুলে যেতে চাইত, তাদেরকে পার্শ্ববর্তী রাখাইন গ্রামে যেতে হতো। আর মিডল স্কুল এবং হাই স্কুলের জন্য তাদেরকে যেতে হতো আরো বড় কোনো গ্রামে কিংবা শহরে।

গ্রামের প্রধান ফয়েজ উল্লাহ ফুতুর প্রস্তাবের সাথে একমত হয়েছিলেন, কিন্তু সাধারণ গ্রামবাসীকে রাজি করাতে তাদেরকে বেগ পেতে হয়েছিল। কয়েক সপ্তাহ ধরে ফুতু বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের বাবা-মায়েদের সাথে দেখা করেন, গ্রামের লোকদেরকে নিয়ে মিটিং করেন।

ফুতু তার সম্প্রদায়ের এবং তাইং-ইয়িন-থা সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করেছিলেন। তারা হয়তো বলত, "আমার ছেলে বিএ পাস" অথবা, "আমার ছেলের মাস্টার্স ডিগ্রি আছে"। কিন্তু ফুতুর সম্প্রদায়ের লোকেরা বলত, "আমার সাত কানি জমি আছে" অথবা, "আমার দুটি গরু এবং একটি ছাগল আছে"। ফুতু চেয়েছিলেন, রোহিঙ্গারাও তাদের জীবনের মূল্যকে ভিন্নভাবে পরিমাপ করতে শিখুক।

সবাইকে রাজি করানো সম্ভব ছিল না। তাদের অনেকে জানতে চেয়েছিল, "যদি আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে বার্মিজ স্কুলে পাঠাই, তারা কি নিজেদের সংস্কৃতি ভুলে যাবে? আমরা তাদেরকে যে মূল্যবোধ শিখিয়েছি, তারা কি সেগুলো অগ্রাহ্য করবে? তারা কি রাখাইনদের মতো বিয়ার পান করতে শুরু করবে?"

তাছাড়া যদি কেউ প্রাইমারি স্কুল, মিডল স্কুল, এমনকি হাই স্কুলও পাশ করে, তাতেও বা কী লাভ? তারা তো কলেজে যেতে পারবে না, ভাল বেতনের সরকারি চাকরি পাবে না, কিংবা পুলিশ বা সেনাবাহিনীতেও যোগ দিতে পারবে না। পরিশ্রমের জন্য এবং ফুটফরমাশ খাটার জন্য গ্রামে ছেলেমেয়েদের দরকার ছিল। ভবিষ্যৎ যেখানে পূর্বনির্ধারিত, সেখানে ঘুষ, বই আর পরীক্ষার পেছনে অর্থ অপচয় করে কী লাভ?

ফুতু যুক্তি দেখিয়েছিলেন, রোহিঙ্গারা যদি শিক্ষিত হয়, তাহলে তারা এই নিয়মগুলোর অবসান ঘটাতে পারবে। তাদের সম্প্রদায় থেকে আরো বেশি মানুষ সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে। তাদের মধ্য থেকে যদি এক ডজন প্রতিনিধি সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়, এরপর কর্তৃপক্ষ যদি সেখান থেকে দু-একজনকে মেরেও ফেলে, তারপরেও বাকিরা তো রয়ে যাবে!

তারা নতুন করে পরিকল্পনা করতে পারবে, কীভাবে তাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনের মধ্যে আলোকচ্ছটা নিক্ষেপ করা যায়।

গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে সাথে নিয়ে ফুতু শেষপর্যন্ত সবাইকে রাজি করাতে সক্ষম হন। সরকারের সাথে যোগাযোগ করে তিনি স্কুলটি নিবন্ধন করানোর ব্যবস্থা করেন। তার ডায়েরিতে তিনি বারবার স্কুল নির্মাণের বাজেটের খসড়া প্রস্তুত করেন। তিনি বুঝতে পারেন, তাদেরকে যে পরিমাণ টাকার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, স্কুল নির্মাণের জন্য তা মোটেও যথেষ্ট ছিল না। সঠিকভাবে নির্মিত একটি স্কুলের জন্য ইউএসপিডির দেওয়া অনুদানের অন্তত দশ গুণ বেশি খরচ হবে।

খরচ কমানোর পরিকল্পনা করার জন্য ফুতু একটি কমিটি তৈরি করে দেন। শ্রমিকদের খরচ বাঁচানোর জন্য তারা ২৫ জন স্বেচ্ছাসেবী সংগ্রহ করেন। দেয়ালের খুঁটিগুলোর জন্য তাদের নারকেল গাছের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এক একটি নারকেল গাছ কিনতে এবং পাহাড় থেকে বহন করে আনতে বিশাল অঙ্কের টাকা ব্যয় হতো। ফুতু নতুন একটি পরিকল্পনা করেন। গ্রামের অনেকের জমিতে এমন অনেক নারকেল গাছ ছিল, যেগুলো বছরের পর বছর ধরে কোনো ফল দেয়নি। তিনি সেই গাছগুলো একটি একটি করে চিহ্নিত করেন এবং তাদের মালিকদের কাছে গিয়ে সস্তায় সেগুলো কিনে নেন। এক সপ্তাহের মধ্যেই গ্রামের সমস্ত বন্ধ্যা নারকেল গাছ স্কুলের খুঁটিতে পরিণত হয়ে যায়।

নির্মাণকাজের সময় আরো স্বেচ্ছাসেবী শ্রমিক জোগাড় করার উদ্দেশ্যে তারা সাইটে রাখা লাউডস্পিকার থেকে হিন্দি এবং ইংলিশ পপ গান বাজাতে শুরু করেন। উৎসবমুখর পরিবেশের টানে যখন দর্শনার্থীরা জড়ো হয়, তখন তারা তাদেরকে নির্মাণকাজে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ জানান।

শিক্ষার্থীরা কূপ থেকে পানি বহন করে এনে আগুনের চুলা জ্বালিয়ে অতিথি শ্রমিকদের জন্য চা বানিয়ে দেয়। চা পান করে স্বেচ্ছাসেবী শ্রমিকরা কাজে লেগে পড়ে। তারা বর্ষাকালের পানির

স্রোতধারা থেকে স্কুলের মাঠকে রক্ষা করার জন্য তার চারপাশে বেড়া তৈরি করে দেয়, যেন বাচ্চারা পিছলে না পড়ে। ক্লাসরুমে সতেজ বাতাসের প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য তারা তেরপলের দেয়াল তৈরি করে। বাচ্চাদের যেন চিত্তবিক্ষেপ না ঘটে, সেজন্য তারা রাস্তার দৃশ্য অবরুদ্ধ করে দেয়।

২০১০ সালে যখন তাদের কাজ সম্পন্ন হয়, তখন দুনসে পাড়ার ইতিহাসের প্রথম সরকারি স্কুলটিতে চারটি ক্লাসরুমে ২৬০ জন শিক্ষার্থীর পড়াশোনার ব্যবস্থা হয়েছিল। শুনতে সহজ মনে হলেও শূন্য থেকে একটি গ্রামের স্কুল প্রতিষ্ঠা করা ছিল অত্যন্ত কঠিন এবং পর্বতপ্রমাণ একটি কাজ। এটি ছিল গভীর একটি নদীর গতিপথকে পরিবর্তন করে দেওয়ার মতো বিশাল একটি কাজ।

এক রোহিঙ্গা স্কুলশিক্ষক এবং তার গণহত্যার ডায়েরি (৪র্থ পর্ব)

২০১৩ সালে বিশাল একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ফুতু বিয়ে করেন। তার স্ত্রী ছিল সুন্দরী। তার চেহারা ছিল কিছুটা গোলাকার এবং নরম ধরনের, তার দৃষ্টি ছিল দ্যুতিময়, ত্বক ছিল জলপাইয় রঙের এবং তার হাসি ছিল ঘণ্টার ছোট ছোট ধ্বনির মতো। ছোটবেলা থেকেই ফুতু তাকে ভালবাসতেন এবং সময়ের সাথে সাথে তিনি গোপনে তার মন জয় করে নিতে পেরেছিলেন।

ফুতুর বাবা-মা যখন আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন, তার মা এবং ভাইয়েরা আগ্রহের সাথে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন: ফুতু ছিলেন শিক্ষিত এবং ইংরেজি জানা যুবক। ফুতুর শাশুড়ি তাদের জুটিকে আশীর্বাদ করেছিলেন।

ততদিনে ফুতুর লাল নোটবুকটি গ্রামবাসীদের উপর নাসাকার অত্যাচার সম্পর্কে ছোট ছোট লেখা দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তিনি ডায়রিটি লিখেছিলেন রোহিঙ্গা ভাষায়, কিন্তু শব্দগুলোর বানান তিনি করেছিলেন ইংরেজি এবং বার্মিজের মিশ্রণে। এটি ছিল এক ধরনের কোড, যার অর্থ কেবল তার পক্ষেই উদ্ধার করা সম্ভব ছিল।

ফুতু তার নিজের দৈনন্দিন কার্যক্রমেরও একটি ডায়েরি রেখেছিলেন। প্রতি রাতে স্ত্রীর সাথে ঘুমাতে যাওয়ার আগে তিনি সেখানে কিছু না কিছু লিখে রাখতেন। দীর্ঘ সময় ধরে কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বালিয়ে রাখার কারণে মাঝে মাঝে তার স্ত্রী তার উপর রেগে যেত। গভীর রাতে রোহিঙ্গাদের বাতি জ্বালানোর অনুমতি ছিল না। এ নিয়ে তাদের কথোপকথনগুলো উত্তপ্ত হয়ে উঠত এবং কখনও কখনও তা ঝগড়ায় রূপ নিত। ফুতু তাকে বোঝানোর চেষ্টা করতেন, তিনি যে তথ্যগুলো লিখছেন সেগুলো অর্থের চেয়েও মূল্যবান। যদি কখনও তার কিছু ঘটে যায় অথবা তিনি মৃত্যুবরণ করেন, তাহলেও তার সংগৃহীত জ্ঞান টিকে থাকবে অনন্তকাল।

ফুতুর ডায়েরির সংখ্যা দিনে দিনে বাড়তে থাকে। যতদিনে তার স্ত্রী দুই পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়, ততদিন পর্যন্ত তার ডায়েরির সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০টিরও বেশিতে। বাবা-মা এবং তিন ভাইয়ের সাথে ফুতু এবং তার স্ত্রী একই বাড়িতে বসবাস করতেন। সেখানেই অল্প খরচে বানানো একটি কাঠের সিন্দুকের ভেতর তিনি তার ডায়রিগুলো লুকিয়ে রাখতেন। সেগুলোকে স্কুলের অন্যান্য বই এবং কাগজপত্রের সাথে একত্রে মিশিয়ে রাখতেন, অনেকটা ক্যামোফ্লাজের মতো করে।

স্কুলটির প্রতিষ্ঠার দুই বছর পর এর কাঠামোতে সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। অর্থ সংগ্রহের জন্য ফুতু একটি ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করেন। ২০১২ সালের জুনের গোড়ার দিকে ফাইনাল

ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন গ্রামবাসীরা যখন মাঠের দিকে যাচ্ছিল, তখন তারা রাখাইনদেরকে দল বেঁধে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে দেখতে পায়।

ফুতু ভেবেছিলেন তারা কাছের একটি পাহাড়ের দিকে যাচ্ছিল, যেখানে রাখাইন বর্ষের সমাপ্তি উপলক্ষে তারা বার্ষিক উৎসবের আয়োজন করে এবং গান ও নাটক পরিবেশন করে। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যার সময় দুনসে পাড়ার লোকেরা যখন খেলা শেষে মাঠ পরিষ্কার করছিল, তখন তারা গুঞ্জন শুনতে পায় যে, কাছের শহরগুলোতে রোহিঙ্গাদের বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পরবর্তী কয়েকদিন ধরে আশেপাশের গ্রামগুলো থেকে দুনসে পাড়ায় ছুটে আসা রোহিঙ্গাদের মুখ থেকে রাখাইনদের দ্বারা তাদের গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়ার এবং তাদেরকে লাঠি ও ছুরি দিয়ে হত্যা করার কাহিনী ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সেবারের সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় শেষপর্যন্ত কয়েক শত লোক মারা গিয়েছিল। এদের মধ্যে কয়েক ডজন শিশুকে টুকরো টুকরো করে হত্যা করা হয়েছিল। আর পুরো সময়জুড়ে নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যরা হয় অন্যদিকে তাকিয়েছিল, অথবা নিজেরাই রাখাইনদের সাথে এই হত্যাযজ্ঞে অংশ নিয়েছিল।

এরকম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা ফুতু আগেও শুনেছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে কখনো চোখে দেখেননি। পরে তিনি জানতে পেরেছিলেন, পুরো ব্যাপারটি শুরু হয়েছিল এক বৌদ্ধ মহিলাকে ধর্ষণ এবং হত্যা করার পর। গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে, ঘটনাটি মুসলমান পুরুষরা ঘটিয়েছে। কাহিনীটি তাৎক্ষণিকভাবে অনলাইনে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং পাল্টা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে মুসলমান পুরুষদের একটি বাসের উপর শতশত রাখাইন ঝাঁপিয়ে পড়ে দশজন মুসলমানকে হত্যা করেছিল।

দুনসে পাড়া যদিও ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে ছিল, কিন্তু সহিংসতার প্রভাব থেকে গ্রামটি মুক্ত ছিল না। বাস্তুচ্যুতদেরকে স্থান দিতে হয়েছিল গ্রামবাসীদের জমির উপর। পাহাড়ের উপর দিয়ে দলে দলে দুনসে পাড়া এবং পার্শ্ববর্তী চেইন খার লি গ্রামে ছুটে আসার পর গৃহহীন রোহিঙ্গারা আর কখনোই ফেরত যায়নি। তারা জানতে পেরেছিল, রাখাইন রাজ্যের রাজধানী সিত্তুইয়ে

রোহিঙ্গাদেরকে স্থান দেওয়া হয়েছিল কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা শহরের কয়েকটি ব্লকে। এরপর থেকে তারা সেই ঘেটোতেই বসবাস করে আসছিল।

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা; Image Source: Himaloy Joseph Mree

রোহিঙ্গাদের অধিকার যখন হরণ করা হচ্ছিল, বহির্বিশ্ব তখনও সেদিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করছিল না। ২০১২ সালের উপ-নির্বাচনে অং সান সু চি পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করার পর তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা মায়ানমারের উপর জারি থাকা নিষেধাজ্ঞা শিথিল করে দেন। ২০১২ সালের সাম্প্রদায়িক সহিংসতার পরপরই প্রথম মার্কিন রাষ্ট্রপতি হিসেবে ওবামা মায়ানমার সফর করেন। তার ভাবাবেগপূর্ণ বক্তৃতায় রোহিঙ্গাদের কথা খুবই সংক্ষেপে একবার স্থান পেলেও বাকি সময়টাতে তিনি জোর দেন মূলত মায়ানমারের নতুন গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের উপর।

দুই বছর পর ফুতু প্রথমবারের মতো ইন্টারনেট অ্যাক্সেসসহ একটি মোবাইল ফোন ব্যবহার করার সুযোগ পান, এবং সেটা তার জীবনকে পাল্টে দেয়। ক্ষুদ্র বস্তুটিতে ধারণকৃত বিপুল পরিমাণ

তথ্যভাণ্ডার দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। কিন্তু যখন তিনি ফেসবুকে প্রথমবারের মতো একটি অ্যাকাউন্ট খোলেন, তখন তার সামনে উন্মোচিত হয় ভিন্ন একটি জগত। তার চোখে পড়ে তাদের সম্প্রদায়কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে রাখাইনদের দেওয়া পোস্টগুলো, তাদেরকে কালার (বিদেশীদের জন্য ব্যবহৃত অবমাননাকর শব্দ), কুকুর এবং ধর্ষক হিসেবে উল্লেখ করে তৈরি করা তাদের ভিডিওগুলো এবং তাদেরকে মায়ানমার থেকে বহিষ্কার করার আন্দোলনগুলো।

তিনি দেখতে পান, দেশের অন্যান্য অংশে মুসলিম মালিকানাধীন দোকানগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, রাস্তাঘাটে মুসলমানদেরকে হত্যা করা হচ্ছে, প্রথমে '৯৬৯' এবং পরবর্তীতে 'মাবাথা' নামে পরিচিত একদল ধর্মান্ধ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সংগঠন বছরের পর বছর ধরে সহিংসতার পক্ষে প্রচার চালিয়ে আসছিল। কিন্তু এগুলো দেখার পরেও ঘটনাগুলো ফুতুর মনে কোনো ধরনের আগাম সতর্কতা সৃষ্টি করেনি।

২০১৫ সালে ফুতু পার্শ্ববর্তী চেইন খার লি গ্রামের প্রথম সরকারি মিডল স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। স্কুলটি পাশাপাশি অবস্থিত দুটি গ্রামের রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানুষজন ভাগাভাগি করে ব্যবহার করত। সে সময় ফুতুর পূর্ণ মনোযোগ ছিল তার ছাত্রদের উপর। অধিকাংশ দিনই তিনি বাসায় যেতেন না, স্কুলের ছাত্রাবাসেই রাত কাটাতেন।

২০১৬ সালের ৯ অক্টোবর ভোরবেলা ফুতু যখন চেইন খার লি গ্রামের মিডল স্কুলের ছাত্রাবাসে ঘুমাচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ করেই দুনসে পাড়ার ধানক্ষেত এবং খড়ের তৈরি বাড়িগুলোর মধ্য থেকে গোলাগুলির আওয়াজ আসতে শুরু করে। কী ঘটছে বোঝার জন্য গ্রামের পুরুষরা বাইরে ছুটে যায়। চোর ধরা পড়েছে? ডাকাত আক্রমণ করেছে? নাকি কোনো দল হানা দিয়েছে? ঘটনা জানার জন্য কর্দমাক্ত পথ মাড়িয়ে তারা ছুটে যায় গ্রামের প্রধান আইয়ুবের কাছে। তাদের ধারণা, আইয়ুবের নিশ্চয়ই ঘটনা জানা থাকার কথা।

আইয়ুব দুই বছর ধরে এই পদে ছিলেন। তিনি পার্শ্ববর্তী রাখাইন গ্রামের প্রধানের অধীনে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, যাকে অনেকেই চেয়ারম্যান নামে চিনত। আইয়ুব ছিলেন ছোটখাটো, গাট্টাগোট্টা

ধরনের একজন ধনী ব্যবসায়ী। কর্তৃপক্ষের সাথে তার বেশ সুসম্পর্ক ছিল। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি তাদের প্রতি তার আনুগত্য এবং অনুরাগ প্রকাশ করে আসছিলেন।

গ্রামের লোকেরা যখন তার টিনের তৈরি বাড়ির সামনে গিয়ে পৌঁছাল, তখন বাড়ির দরজা ছিল ভেতর থেকে বন্ধ। গ্রামবাসীরা তার দরজা পেটাতে শুরু করল। "কী হচ্ছে এখানে?" বেরিয়ে এসে জানতে চাইলেন তিনি। তার কোনো ধারণাই ছিল না বাইরে কী ঘটছে।

ভোর হওয়া পর্যন্ত গ্রামের লোকেরা একসাথে রাত কাটালো। বন্দুকযুদ্ধ ততক্ষণে স্তিমিত হয়ে এসেছিল এবং উদ্বিগ্ন জনতার ভিড় আইয়ুবের বাড়ি ছেড়ে বড় গ্রামের প্রধান মসজিদের পাশের চায়ের স্টলটিতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। সকাল বেলা ফুতু যখন ফিরে এলেন, ততক্ষণে পুরো দুনসে পাড়ায় আতঙ্কে ছড়িয়ে পড়েছিল।

আইয়ুব এবং ছোট ছোট গ্রামগুলোর নেতৃত্বে থাকা তার ডেপুটি চিফদের ডাক পড়ল মায়ানমার বর্ডার গার্ড পুলিশ তথা বিজিপির (BGP) চেকপোস্টে। নিরাপত্তাবাহিনীর একটি দল পুরো গ্রামটিকে ঘিরে রেখেছিল। পুরুষরা গ্রামের মহিলাদেরকে বাড়ির ভেতর থাকতে নির্দেশ দিলো। তারা নিজেরা এদিকে সেদিকে বিচ্ছিন্নভাবে ঘোরাঘুরি করে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করতে লাগল।

চেকপোস্টে বিজিপি সদস্যরা আইয়ুবকে ভেতরে নিয়ে গেল। তাদের সেক্টর কমান্ডার আইয়ুবকে এক বন্দী জঙ্গির ছবি দেখালেন। সম্ভবত সে ছিল সহিংসতার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের মধ্যে একজন।

"আপনি কি একে চেনেন?" কমান্ডার জিজ্ঞেস করলেন।

আইয়ুব উত্তর দিলেন, তিনি চেনেন না।

এরপর তারা তাকে আরেক জঙ্গির মৃতদেহ দেখাল।

"একে চেনেন?"

আইয়ুব কসম কেটে বললেন, তিনি চেনেন না। জিজ্ঞাসাবাদের পর বন্দী লোকটাও আইয়ুবের দাবিকে সমর্থন জানাল। সে বলল, তারা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কোনো সহযোগিতা ছাড়াই চেকপোস্টে হামলা করতে এসেছিল।

বিকেলে সেক্টর কমান্ডার আইয়ুবকে মৃতদেহটি গোপনে দাফন করে ফেলার নির্দেশ দিলেন। লোকটির দাড়ি ছিল, কাজেই সে নিশ্চয়ই মুসলমান। কমান্ডার তাকে বললেন, *"সবচেয়ে ভালো হবে আপনি যদি একে মুসলমানদের কবরস্থানে কবর দেন। তিন জন লোককে সাথে নিয়ে যাবেন, আর নিশ্চিত করবেন যেন কেউ দেখে না ফেলে।"*

গ্রামে ফিরে এসে আইয়ুব দুজন সাইঙ্গম তথা ঘোষককে ডেকে পাঠান। তিনি তাদের হাতে কর্তৃপক্ষের জারি করা নতুন একটি বিধি-নিষেধের তালিকা তুলে দেন। ঘোষকদুজন গ্রামের কর্দমাক্ত পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঘোষণাটি পাঠ করে গ্রামবাসীদেরকে জানিয়ে দিতে থাকে: সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কারফিউ! আজান দেওয়া নিষিদ্ধ! পুরুষদের চারজনের বেশি একত্রিত হওয়া নিষিদ্ধ! মাদ্রাসাগুলো স্থগিত! মাছ ধরা এবং কাঠ সংগ্রহের জন্য পাহাড়ে যাওয়া নিষিদ্ধ! প্রতিটি বাড়ির বাইরের বেড়া ভেঙে ফেলা বাধ্যতামূলক!

এক মুহূর্তের মধ্যে গ্রামের মানুষদের জীবিকা অর্জনের পথ বন্ধ হয়ে যায়। কেউ বুঝতে পারছিল না কী ঘটছিল। দুদিন পর ৯ অক্টোবরের হামলার দায় স্বীকার করে একটি গ্রুপ অনলাইনে একটি ভিডিও পোস্ট করে। তারা প্রথমে নিজেদেরকে হারাকাহ আল ইয়াকিন তথা ফেইথ মুভমেন্ট এবং পরবর্তীতে আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি তথা আরসা (ARSA) বলে দাবি করে।

হঠাৎ করেই দুনসে পাড়ার সবাই, এমনকি ছোট ছোট বাচ্চারাও, তাদেরকে নিয়ে কথা বলতে শুরু করে। তারা অবাক হয়ে ভাবতে থাকে, এই লোকগুলো কারা? তারা কোন গ্রাম থেকে এসেছে?

দলটি ছিল রাজনৈতিক কারণে সৌদি আরবে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের একটি কমিটির নেতৃত্বে গঠিত। রোহিঙ্গা ভাষায় অনলাইনে পোস্ট করা ভিডিওতে তারা ব্যাখ্যা করে, ২০১২ সালের

অত্যাচার তাদেরকে সংগঠিত হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তারা একইসাথে বিজিপির দুটি চেকপোস্টে এবং মংডু শহরের বিজিপি সদর দফতরে হামলা চালিয়েছিল।

এটা বড় ধরনের কোনো আক্রমণ ছিল না, কিন্তু এটা সবাইকে অবাক করে দিয়েছিল। মোট নয় জন পুলিশ এবং আট জন জঙ্গি নিহত হয়েছিল। জঙ্গিরা ৬২টি আগ্নেয়াস্ত্র এবং ১০,০০০-এরও বেশি গোলাবারুদ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। সরকারের ধারণা অনুযায়ী মোট হামলাকারীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০০। তারা স্থানীয় জনগণের বিরুদ্ধেও জঙ্গিদেরকে সাহায্য করার অভিযোগ তোলে।

এক রোহিঙ্গা স্কুলশিক্ষক এবং তার গণহত্যার ডায়েরি (৫ম পর্ব)

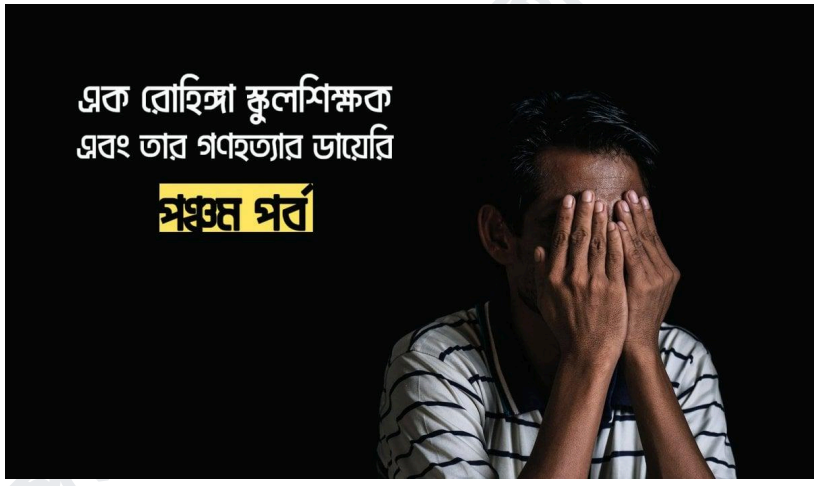

আরসার (ARSA) ভিডিওটি অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ার পর নিরাপত্তাবাহিনী আবার দুনসে পাড়ায় ফিরে আসে। তাদের অফিসাররা গ্রামে টহল দিয়ে ঘুরে বেড়াতে শুরু করে। একটি দল ফুতুর বাড়ির দিকে এগিয়ে আসে। তারা সবাইকে বাইরে বেরিয়ে আসতে বলে এবং তাদের পারিবারিক তালিকা বের করার নির্দেশ দেয়। পারিবারিক তালিকা হচ্ছে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের একটি সরকারি রেকর্ড। নিরাপত্তাবাহিনী প্রতিটি পরিবারের অনুপস্থিত সদস্যদের নাম তালিকা থেকে কেটে দিচ্ছিল এবং তাদের গ্রামে ফিরে আসার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছিল।

ফুতুদের পরিবারের সবাই তাদের বাড়ির আঙিনায় বেরিয়ে আসে। কেবলমাত্র ফুতুর বড় ভাই বাদে সেখানে সবাই উপস্থিত ছিল। ফুতুর বড় ভাই এক দশকেরও বেশি আগে ঝুঁকিপূর্ণ সমুদ্রপথ দিয়ে মালয়েশিয়ায় পালিয়ে গিয়েছিলেন, যে পথে গত কয়েক বছরে হাজার হাজার মানুষ মারা গেছে। অফিসারদেরকে প্রথমে সন্তুষ্ট মনে হচ্ছিল। তারা ফুতুদের সবাইকে ঘরে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে নিজেরাও বেরিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই তাদের কমান্ডার ঘুরে দাঁড়ান এবং ফুতুকে ডাক দেন।

"৯ অক্টোবর আপনি কোথায় ছিলেন?" কমান্ডার জিজ্ঞাসা করলেন।

ফুতু উত্তর দিলেন, তিনি ছিলেন মিডল স্কুলের ছাত্রাবাসে, তারা ইচ্ছে করলে রাখাইন চেয়ারম্যানের সাথে কথা বলে দেখতে পারে। কমান্ডার তার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন। এরপর কাছে এসে তার চুলের মুঠি ধরে নিজের দিকে টেনে নিয়ে বলতে শুরু করলেন, "তোরা তাতমাদাওর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিস কেন?" একদলা থুথু ফেললেন তিনি। "কেন তোরা এই সহিংসতা করছিস?"

"আমি কোনো ধরনের সহিংসতায় জড়িত নই।" ফুতু উত্তর দিলেন। "কেন আমি সহিংসতা করব? আপনারা তো আমাদের ভাইয়ের মতো।"

ফুতু বিজিপি অফিসারদের মধ্যে একজনকে চিনতে পারলেন। প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার সময় তিনি যে চেকপোস্ট পার হয়ে যেতেন, অফিসারটা সেই চেকপোস্টের দায়িত্বে ছিল। তারা প্রায়ই পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময় করতো। কখনো কখনো একসাথে ফুটবলও খেলতেন। ফুতু মিনতি করলেন, "আমি এই অফিসারকে চিনি। উনিও আমাকে চেনেন। কেন আপনারা আমাদেরকে সন্দেহ করছেন? আমরা একে অন্যকে সাহায্য করি, একে অন্যের উপকার করি। আমি কখনোই এ ধরনের কাজের সাথে যুক্ত ছিলাম না। আমি একজন শিক্ষক।"

কমান্ডার ফুতুর চুলের মুঠি ধরে রাখলেন। "বাংলাদেশ থেকে আসা লোকেরা কেন পুলিশ আর সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন। ফুতু কোনো উত্তর না দিয়ে নিজেকে

শান্ত রাখলেন। অবশেষে কমান্ডার তার চুলের মুঠি ছেড়ে দিয়ে দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেলেন। যাওয়ার আগে তাদের অফিসাররা বাড়ির বাইরের চারপাশের বেড়াটি লাথি মেরে ভেঙ্গে দিয়ে গেল।

কাঁটাতারের বেড়ার ওপাশে মায়ানমারের নো ম্যান'স ল্যান্ডে আটকা পড়া রোহিঙ্গারা; Image Source: Ye Aung Thu/AFP/Getty Images

আরসার আক্রমণের পরবর্তী দিনগুলোতে গ্রামের পুরুষদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। গ্রামের প্রধান আইয়ুবের ভাই ছিলেন মাদ্রাসার একজন শিক্ষক। প্রথমে তাকে মারধর করা হয় এবং এরপর আইয়ুবকেও তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। আইয়ুবকে যেদিন আটক করা হয়, সেদিন তার সাথে থাকা দুজন প্রতিনিধি পাহাড়ের দিকে পালিয়ে যান এই আশঙ্কায় যে, তারা হয়তো হবেন পরবর্তী টার্গেট।

কয়েক সপ্তাহ পর একদিন রাখাইন চেয়ারম্যান খবর পাঠান, দুনসে পাড়াসহ আশেপাশের এলাকাগুলোর পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদল আসবে। গ্রামবাসীরা বুঝতে পারছিল না, তাদের কী আশা করা উচিত। ২০১৫ সালের নির্বাচনের পর যখন

অং সান সু চি দেশের ডি ফ্যাক্টো প্রধান হয়ে উঠেছিলেন, তখন কেউ তার নতুন নেতৃত্বকে পূর্ববর্তী অপরাধের জন্য দায়ী করেনি।

বহু বছর ধরে চলা বর্ণবাদী শাসনের দায় থেকে নারী নেত্রীকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিভিন্ন অজুহাত ব্যবহার করে আসছিল। তার মধ্যে এই অজুহাতও ছিল যে, সরকার নয়, বাস্তবে দেশ পরিচালনা করছে তাতমাদাও। কিন্তু আরসার আক্রমণের পর ততমাদাও যখন 'অঞ্চল মুক্তকরণ কার্যক্রম' শুরু করে, তখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দিতে বাধ্য হয়।

ফুতু যখন মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন তিনি প্রবীণ এবং অল্প বয়সী শিক্ষার্থীদের একটি দলকে দেখতে পেলেন। তারা মাটিতে বসে আলোচনা করছিল, বিদেশিরা এলে তাদের কী করা উচিত। তাদের উপর নিপীড়নের কথা উল্লেখ করে ইংরেজিতে সাইনবোর্ড তৈরির পক্ষে-বিপক্ষে তারা বিতর্ক করছিল। একজন প্রস্তাব দিলো, তারা ইংরেজি বড় হাতের অক্ষরে "RAPE, GENOCIDE, KILLING, TORTURE" শব্দগুলো লিখতে পারে। আরেকজন বলল, তারা কোনো একজন শিক্ষককে দিয়ে ইংরেজি শব্দগুলোর বানান সঠিকভাবে লিখিয়ে নিতে পারে।

ফুতু ব্যাপারটি সম্পর্কে তার নিজের ধারণা নিয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলেন না। ২০১২ সালের দাঙ্গার সময় তাদের গ্রামে এরকম কোনো সমস্যা হয়নি। তারা তাদের রাখাইন প্রতিবেশীদের সাথে শান্তি এবং সম্প্রীতি বজায় রেখে বসবাস করে আসছিলেন। এরকম সময়ে এ ধরনের জিনিস লেখা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

ফুতু নিজেকে কখনো সাহসী মানুষ হিসেবে দাবি করেননি। তিনি কেবল ২০১৩ সালের সাইক্লোনে ধ্বসে পড়া স্কুলটি মেরামতের ব্যাপারেই আগ্রহী ছিলেন। তিনি মাথা নিচু করে রাখলেন, যেন আলাপকারীদের সাথে তার চোখাচোখি না হয়ে যায়। তিনি দ্রুত নামাজ শেষ করে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের হাতে বন্দী রোহিঙ্গা মুসলমানরা; Image Source: Reuters

বিদেশিরা এলো ফসল কাটার সময়। ধান গাছের শীর্ষে থাকা চালগুলো তখন শক্ত এবং সোনালি হয়ে এসেছিল। সেগুলো কাটা, মাড়াই করা এবং রোদে শুকানোর উপযোগী হয়ে উঠেছিল। বিদেশিদেরকে বহনকারী হেলিকপ্টারটি যখন নেমে এলো, ততক্ষণে মাঠের কাজ ফেলে দিয়ে গ্রামের লোকেরা সবাই ধুলোমাখা রাস্তায় এসে জড়ো হয়েছে। কেউ কেউ প্ল্যাকার্ড ধরে রেখেছিল। কিন্তু অনেকে শুধু বিদেশীদেরকে এক ঝলক দেখার জন্য এমনভাবে ভিড় করছিল, যেন এটা একটা ফুটবল ম্যাচ। একটা সাইনবোর্ডে ইংরেজিতে লেখা ছিল, “আর কত দিন আমরা রাখাইন এবং বিজিপি দ্বারা গণহত্যা আর রোহিঙ্গা মা-বোনদের ধর্ষণ সহ্য করব।” ফুতুর মনে হলো, তার ছাত্ররা ফেসবুক থেকে শব্দগুলোর সঠিক ইংরেজি বানান খুঁজে বের করেছে।

বিদেশীদের মধ্যে ছিল কয়েকজন পুরুষ এবং একজন মহিলা। তারা তাদের নিজেদের দেশীয় পোশাক পরেছিল। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস ছিল, বিদেশিরা আসলেই তাদেরকে সাহায্য করতে এসেছে। প্রতিনিধিরা সাধারণত তাদের নিজস্ব অনুবাদক নিয়ে আসে, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই এই অনুবাদকরা রোহিঙ্গা বলতে পারে না। আবার অন্যদিকে বেশিরভাগ গ্রামবাসী বার্মিজ বলতে পারে

না। শেষপর্যন্ত রাখাইন চেয়ারম্যানকে অনুবাদের দায়িত্ব দেওয়া হলো, কিন্তু তিনি উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

সরকারি কর্মকর্তারা ফুতুকে জিজ্ঞেস করল, তিনি সাহায্য করতে পারবেন কি না। আরেকজন শিক্ষকসহ ফুতু সামনে এগিয়ে গেলেন। এক বৃদ্ধ মহিলা অনবরত কেঁদে চলছিল। প্রতিনিধিরা জানতে চাইল, তার সমস্যা কী। মহিলাটি ব্যাখ্যা করল, তার ভাইকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সে কোথায় আছে, জীবিত না মৃত, তার কোনো ধারণা নেই।

অন্যান্য গ্রামবাসীরাও তাদের পরিস্থিতি বলার চেষ্টা করছিল:

> "আমাদের প্রকৃত জাতিসত্তার কোনো স্বীকৃতি নেই। আমাদের কোনোকিছু করার অনুমতি নেই। আমাদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার স্বাধীনতা নেই। আমাদের বিয়ে করার জন্য অনুমতি নিতে হয়। আমাদের কোনো ধরনের অধিকার নেই। তারা বলে, আমরা বিদেশি। তারা বলে, আমরা বাঙালি। কিন্তু আমরা বাঙালি না। আমাদের সকল পূর্বপুরুষ, বাবারা, দাদারা দীর্ঘকাল ধরে এখানে বসবাস করে এসেছেন। কেন তারা আমাদেরকে নাগরিক হিসেবে গ্রহণ করে না? আপনারা বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা দয়া করে এই সমস্যাটি সমাধান করার চেষ্টা করুন এবং আমাদেরকে স্বীকৃতি দিন।"

পরিদর্শন শেষে প্রতিনিধি দলটির সদস্যরা তাদের গাড়ির দিকে ফিরে যেতে শুরু করে, কিন্তু রাখাইন চেয়ারম্যান পেছনে রয়ে যান। গ্রামবাসীদের দিকে ফিরে ক্রুদ্ধস্বরে তিনি বলেন, "তোমরা আমাদের সম্পর্কে অভিযোগ করেছ, আমাদের সরকারকে বিব্রত করেছ। এর জন্য তোমাদেরকে ভুগতে হবে।"

কয়েকদিন পর এক সকালে গ্রামবাসীরা প্রধান সড়কের উপর এক ডজন বিজিপি ট্রাক পার্ক করা অবস্থায় দেখতে পায়। ফুতু এবং তার বাবা দৌড়ে বাসায় গিয়ে ফুতুর ডায়েরিগুলি লুকিয়ে ফেলেন। তারা সেগুলোকে একটি বস্তার ভেতর ভরে ধানক্ষেতের মধ্যে কিছু ঝোপের আড়ালে ফেলে রাখেন। বাড়িতে ফেরার সময় তারা দেখতে পান, বিজিপি অফিসাররা বড় গ্রামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বেলা ১১টার দিকে তারা সাইঙ্গমদের ঘোষণা শুনতে পান: ১২ বছরের বেশি বয়সী সকল পুরুষকে বড় গ্রামে গিয়ে হাজিরা দিতে হবে!

বড় গ্রামে পৌঁছে ফুতু তাদের প্রতিবেশীদেরকে দেখতে পান। কয়েকশ, কিংবা কে জানে হয়তো কয়েক হাজার মানুষ সেখানে সারি বেঁধে একইরকম অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে বসেছিল। দুই পা সামনের দিকে ছড়িয়ে, মাথা নিচু করে, দুই হাত দিয়ে ঘাড়ের পেছনে আঁকড়ে ধরে বসেছিল তারা। বিজিপি সেনারা লাইন ধরে দাঁড়িয়েছিল। নতুন বন্দীরা আসামাত্রই অফিসাররা তাদেরকে লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছিল অথবা বুট দিয়ে এলোপাথাড়ি লাথি মারছিল। তারা প্রতিটি বন্দীকে তাদের ঘড়ি খুলে বড় একটি চকচকে স্তূপের মধ্যে ফেলে দিতে বাধ্য করছিল।

ফুতু তার ঘড়িটা দিয়ে দিলেন। এটা ছিল শ্বশুরবাড়ি থেকে তাকে দেওয়া বিয়ের উপহার, যেটা তারা নিয়ে এসেছিল মায়ানমারের সাবেক রাজধানী ইয়াঙ্গুন থেকে। কিন্তু নিজের জায়গায় গিয়ে বসার আগেই ফুতুকে লাইনের বাইরে ডেকে নিয়ে যাওয়া হলো। অফিসাররা তার হাতদুটি পিঠের পেছনে

নিয়ে বেঁধে ফেলল এবং তাকে পেটাতে শুরু করল। কোনো কথাবার্তা ছাড়াই তারা তার মাথায় এবং শরীরে একের পর এক আঘাত করে যাচ্ছিল।

ফুতু মাটিতে পড়ে গেলেন, কিন্তু আঘাত বন্ধ হলো না। তার শরীর থেকে রক্ত ঝরতে শুরু করল, তার মাথা ঘোরাতে লাগলো, এবং একপর্যায়ে তিনি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। মাঝে মাঝে একটু সময়ের জন্য তার জ্ঞান ফিরে আসছিল। এরমধ্যেই তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হতে লাগলো। অফিসাররা ধারালো ছুরির অগ্রভাগ দিয়ে তার শরীরের চামড়ায় খোঁচা দিতে লাগলো, সিগারেট দিয়ে তার বাহুতে ছ্যাঁকা দিতে থাকল। গ্রামবাসীদের সামনেই ফুতুর উপর নির্যাতন চলছিল, কিন্তু তারা কেউ তাতে অবাক হয়নি। শিক্ষিতদের সাথে কর্তৃপক্ষ কী ধরনের আচরণ করে, সেটা তাদের সবার জানা ছিল।

ফুতু যখন জ্ঞান ফিরে পেলেন, তখনও তার হাতদুটি পেছন দিকে বাঁধা ছিল। তার পিঠ, পেট, হাত, মাথা, সারা শরীর ব্যথা করছিল। তাকে দল থেকে কিছুটা দূরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কেউ তার অবস্থার প্রতিবাদ করলে কিংবা তার দিকে তাকালে তাকে আরো কঠোরভাবে মারধর করা হচ্ছিল।

বিজিপি অফিসাররা সিগারেট জ্বালিয়ে ধূমপান করছিল এবং নিজেদের মধ্যে গল্প করছিল। একজন অফিসার তার মোবাইল ফোন দিয়ে ফুতুকে ভিডিও করছিল। সে ফোনটা মাঝে মাঝে এমনভাবে ঘুরিয়ে নিজের মুখের দিকে ধরছিল, যেন সে ছুটির দিনে কোথাও বেড়াতে গিয়ে সেলফি তুলছে।

একজন অফিসার চিৎকার করে ফুতুকে উঠে দাঁড়াতে নির্দেশ দিলো। ফুতু সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিলেন না, কিন্তু তারপরেও তিনি অফিসারটাকে অনুসরণ করে তার পিছু পিছু একটা উন্মুক্ত জায়গায় গেলেন, যেখানে তিনজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সুপারি গাছের ছায়ায় বসেছিল।

তাদের একজন ফুতুকে জিজ্ঞেস করল, “তুই প্রতিনিধিদলের হয়ে অনুবাদ করেছিলি?”

ফুতু সায় দিলেন, তিনি অনুবাদ করেছিলেন। “এটা তোদের দেশ না,” অফিসারটি বলতে লাগলো। “তোরা রোহিঙ্গা। তোদের পূর্বপুরুষরা বাংলাদেশ থেকে এসেছিল। অথচ তোরা দাবি করিস তোরা এই দেশের আদিবাসী? তোরা অধিকার চাস? কত বড় সাহস তোদের!”

ফুতু লক্ষ্য করলেন, অফিসারদের মধ্যে একজন ছিল নিকটবর্তী বিজিপি পোস্টের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। আরেকজন ছিল এমন এক জন, যার সাথে তিনি ফুটবল খেলতেন। ফুতু তার দিকে তাকিয়ে বললেন, “আমি এখানকার একজন স্কুলশিক্ষক।”

“প্ল্যাকার্ডগুলি কে লিখেছিল?” অফিসাররা তাকে জিজ্ঞেস করল।

“আমি জানি না,” ফুতু উত্তর দিলেন। “আমি জানি না।”

চেকপোস্টের প্রধান অফিসারটি এগিয়ে ফুতুর মাথায় একটি রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করল।

অফিসাররা তার কাছ থেকে আরসা সম্পর্কে জানতে চাইছিল। ফুতু বললেন, তিনি তাদের সম্পর্কে কিছুই জানেন না।

রাখাইন চেয়ারম্যান সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অফিসাররা তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, “কেমন মানুষ এ?”

“আমি এর বাবা-মাকে চিনি, এর পূর্বপুরুষদেরকে চিনি,” চেয়ারম্যান উত্তর দিলেন। “সে মানুষ হিসেবে ভালো। সোজা স্কুলে যায়, এরপর স্কুল থেকে সোজা বাসায় ফিরে যায়। প্ল্যাকার্ড লেখার সাথে হয়তো সে জড়িত থাকতে পারে, কিন্তু তার সাথে কোনো খারাপ লোকের সম্পর্ক নেই।”

ফুতু যতটা আশা করেছিলেন, এটা ছিল তার জন্য তার চেয়েও ভালো ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট। “অন্যান্য পুলিশ এবং সেনাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন আমাদের সম্পর্ক কতটা ভালো ছিল।” নিজেকে নিয়ন্ত্রণ না করতে পেরে অনুনয়ের স্বরে বললেন ফুতু। “তাদের সামনে দিয়ে আমি স্কুলে

এক রোহিঙ্গা স্কুলশিক্ষক এবং তার গণহত্যার ডায়েরি

যাই এবং স্কুল থেকে সরাসরি ফিরে আসি! প্রতিদিন! আমি এই লোকগুলোর কাউকেই চিনি না। আমি কখনও এ ধরনের কাজে জড়িত ছিলাম না!”

অবশেষে ফুতুকে অন্যদের কাছে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো। তার জীবন আপাতত রক্ষা পেয়ে গেল।

সন্ধ্যা নাগাদ বৃষ্টি শুরু হলো। রোহিঙ্গা বন্দীরা যে কাদামাটির উপর বসেছিল, সেটা সরে যেতে শুরু করল। অফিসাররা বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়া বন্দীদেরকে উঠে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিলো। তাদেরকে দোতলা একটা খড়ের চালের বাড়ির ভেতর নিয়ে যাওয়া হলো, যার ভেতরের দেয়ালগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। কয়েকশ মানুষকে গাদাগাদি করে, একজনের উপর আরেকজনকে ফেলে ঘরটির ভেতর ঠেলে দেওয়া হলো।

সকাল বেলা নারী এবং শিশুরা উপস্থিত হলো। তাদেরকে বলা হয়েছিল, তারা বন্দীদের জন্য খাবার আনতে পারবে। ফুতুর মা ভাত আর মাছের তরকারী নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু ব্যথার জন্য ফুতু খাবার গিলতে পারছিলেন না।

পুরুষরা যখন খাবার খাচ্ছিল, বিজিপি সৈন্যরা তখন মহিলাদের উপর হানা দিচ্ছিল। তারা বড় গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে অভিযান শুরু করেছিল, বাড়িঘরের জিনিসপত্র তন্ন তন্ন করে সার্চ করতে শুরু করেছিল। মহিলাদের গলা থেকে স্বর্ণালঙ্কার এবং ব্লাউজের ভেতরে লুকানো মোবাইল ফোনগুলো তারা ছিনিয়ে নিচ্ছিল। তারা মহিলাদেরকে ধাওয়া করছিল এবং যাদেরকে ধরতে পারছিল, তাদের সারা শরীর স্পর্শ করছিল।

ফুতুর বাড়িতে তাঁর স্ত্রী, ফুতুর এক বোন এবং তার ১১ বছর বয়সী ভাই একটা গাছের নিচে বসে অফিসারদেরকে তাদের বাড়ির জিনিসপত্র বাইরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে দেখছিল। অফিসাররা ফুতুর সিন্দুক ভেঙ্গে তার কাগজপত্রগুলো সংগ্রহ করতে শুরু করেছিল। ফুতু ছাড়া অন্য সবার কাছে কাগজপত্রগুলো ছিল মূল্যহীন। এমনকি তার সদাসতর্ক বাবাও সেগুলো লুকানোর চিন্তা করেননি।

ফুতুর স্ত্রী ছিলেন আট মাস গর্ভবতী, তার গর্ভে ছিল তাদের দ্বিতীয় সন্তান। তিনি কখনও তার শাশুড়িকে সাহসী বলে জানতেন না। কিন্তু সেদিন তার শাশুড়ি অফিসারের সামনে গিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, "আপনারা কী করছেন? কেন আপনারা আমার ছেলের কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছেন?" মাত্রই আহত ছেলেকে দেখে এসেছিলেন তিনি, আর কতক্ষণ তার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব?

ফুতুর স্ত্রী বিস্ফোরিত চোখে দেখতে পেলেন, তার শাশুড়ি একজন অফিসারের হাত থেকে কিছু কাগজপত্র কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। লোকটি কাগজগুলো ছাড়ল না। একটিমাত্র পৃষ্ঠা, যেটি ফুতুর মা মাটি থেকে কুড়িয়ে তার বুকের ভেতর লুকিয়ে ফেলতে পেরেছিলেন, সেটি বাদে বাকি সবগুলো কাগজপত্র নিয়ে তারা চলে গেল। ফুতুর ডায়েরিগুলো অবশ্য নিরাপদ ছিল। সেগুলো সেদিন সকালেই তিনি এবং তার বাবা মিলে লুকিয়ে ফেলেছিলেন।

বিজিপি কমান্ডার ব্যাখ্যা করেছিলেন, যেহেতু আইয়ুবকে আটক করা হয়েছে এবং তার দুই ডেপুটি পালিয়ে গেছে, তাই তাদের নতুন একটি নেতৃত্বের দরকার। তিনি ফুতুকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি দায়িত্ব নিতে চান কি না। ফুতু উত্তর দিলেন, "আমি শুধু একজন শিক্ষক। এই দায়িত্ব আমি নিতে চাই না।"

কমান্ডার রোহিঙ্গা বন্দীদেরকে তাদের নতুন নেতা বাছাই করার নির্দেশ দিলেন। সবাই ফয়েজ উল্লাহর দিকে তাকাল, কারণ আইয়ুবের আগে তিনিই এই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ফয়েজ উল্লাহ বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। মেনে নেওয়া ছাড়া তার আর কোনো উপায় ছিল না।

কমান্ডার তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "এবার আমরা তোদেরকে ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু পরের বার আমরা তোদের ঘরগুলো পুড়িয়ে সেগুলোকে ছাই বানিয়ে দিবো।" ভিড়ের দিকে নিজের রাইফেলটি তাক করে তিনি বললেন, "এবার আমরা শুধু তোদেরকে মুখে সতর্ক করে দিলাম। পরের বার এটা কথা বলবে!"

অফিসাররা ফুতুর সামনে একটি সাদা কাগজ নিয়ে এলো। সেখানে ফুতুকে লিখতে বাধ্য করা হলো: “বিজিপি আমাদের গ্রামে এসেছিল। তারা সবকিছু ঠিক আছে কি না, তা যাচাই করে দেখেছে। তারা কোনো হয়রানি বা লুটপাট করেনি। তারা আমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করেছে।” রোহিঙ্গা বন্দীরা সেই কাগজের নিচে নিজেদের নাম সই করল।

এক রোহিঙ্গা স্কুলশিক্ষক এবং তার গণহত্যার ডায়েরি (৭ম পর্ব)

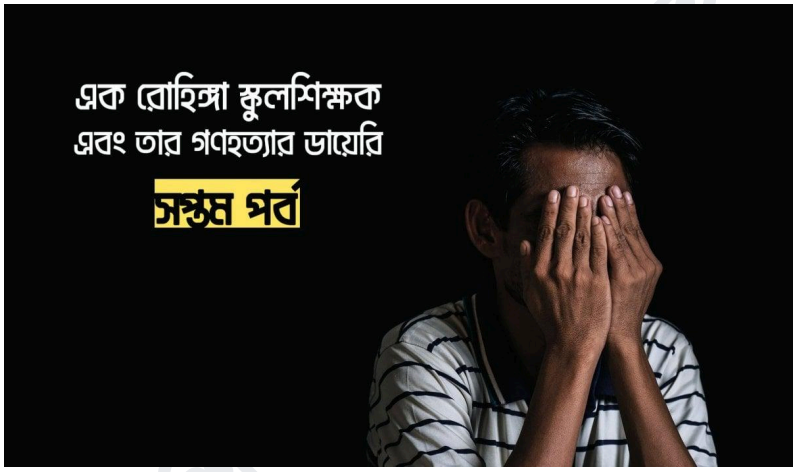

গণগ্রেপ্তারের পরের দিনগুলোতে যারা পাহাড়ের উপর পালিয়ে গিয়েছিল, তারা আবার দুনসে পাড়ায় ফিরে আসতে শুরু করে। যারা ধানক্ষেতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, তারাও রাতের অন্ধকারে ফিরে আসে। শেষপর্যন্ত গ্রামবাসীরা মোট ১০ জনকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়, যাদেরকে আটক করার পর বিজিপি আর ছাড়েনি। এদের মধ্যে বিদেশি প্রতিনিধিদলের জন্য অনুবাদ করা দ্বিতীয় অনুবাদকও ছিলেন। এই লোকগুলোকে কোথায় আটকে রাখা হয়েছে কিংবা তাদের উপর নির্যাতন করা হচ্ছে কিনা, তার খোঁজেই তাদের আত্মীয়-স্বজনদের পরবর্তী দিনগুলো কেটে যেতে থাকে।

দুনসে পাড়ার অধিবাসীদের ছোট পৃথিবী দিনে দিনে আরো সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল। বিধিনিষেধগুলো তখনো বলবৎ ছিল। পুরুষরা পাহাড় থেকে কাঠ কাটতে কিংবা সমুদ্র থেকে মাছ

ধরতে পারত না। অথচ তাদের পরিবারের জন্য খাবার দরকার ছিল, বিয়ের জন্য ফি পরিশোধ করা বাকি ছিল, দুই শিশু আইনের অতিরিক্ত সন্তানের নিবন্ধনের জন্য ঘুষ দিতে হচ্ছিল। মরিয়া হয়ে কেউ কেউ কাঠের টুকরা সংগ্রহের জন্য লুকিয়ে পাহাড়ে উঠে যেতে শুরু করে। অন্যরা নৌকা বা জাল দিয়ে মাছ ধরা নিষিদ্ধ বলে নিজেদের শরীরের সাথেই প্লাস্টিকের ব্যাগ বেঁধে সমুদ্রের দিকে ছুটে যেতে থাকে।

২০১৬ সালের ৯ অক্টোবরের হামলার পর থেকে আরসার শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তারা স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে ইমামদের নেতৃত্বে কয়েক ডজন গ্রামে গোপন সেল প্রতিষ্ঠা করে। তারা অর্থ ও অধিকারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে হতাশাগ্রস্ত যুবকদেরকে দলে টেনে নেয়। কিন্তু একইসাথে তাদের আরেকটি বিপজ্জনক দিকও প্রকাশ পেতে থাকে। তারা রোহিঙ্গাদেরকেও টার্গেট করতে শুরু করে এই সন্দেহে যে, তারা বিজিপির গুপ্তচর। তারা এক ডজনেরও বেশি গ্রামের প্রধান এবং অন্যান্য স্থানীয় প্রশাসকদেরকে হত্যা করে।

ফয়েজ উল্লাহর উপর চারদিক থেকে চাপ আসছিল। তিনি যদি আরসার কথা রিপোর্ট করেন, তাহলে তাকে শত্রুপক্ষের সাথে সহযোগিতার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। অন্যদিকে সামরিক বাহিনী তাকে আরসা সম্পর্কিত তথ্যের জন্য চাপ দিচ্ছিল, যদিও তার কাছে আসলে দেওয়ার মতো কোনো তথ্য ছিল না। গ্রামবাসীরা কসম কেটে বলেছিল, তারা কখনোই সত্যিকারের কোনো আরসা সদস্যকে কাছ থেকে দেখেনি বা তাদের কথা শোনেনি। কিন্তু কে জানে পাহাড়ের উপর কী ঘটছে, যেখানে তাদের আইনগতভাবে যাওয়ারই অনুমতি নেই।

গ্রাম অবরুদ্ধ হওয়ার পর থেকেই স্কুল বন্ধ ছিল। পড়ানোর মতো কোনো ছাত্র না থাকায় ফুতু নিজেই বইগুলো নেড়েচেড়ে দেখছিলেন। তিনি সংবাদপত্র পড়ে এবং রেডিও শুনে সময় কাটাচ্ছিলেন, কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি অধৈর্য হয়ে উঠতে শুরু করেছিলেন। ছাত্রছাত্রীরা তাদের রাখাইন সহপাঠীদের চেয়ে পেছনে পড়ে যাচ্ছিল। তিনি গ্রামের লোকদেরকে বলাবলি করতে শুনছিলেন, স্কুল যদি আবার চালু হয়, তবুও তারা তাদের বাচ্চাদেরকে সেখানে ফেরত পাঠাবেন

না। মিডল স্কুলটির অবস্থান চেইন খার লি গ্রামে, দুনসে পাড়ার চেকপোস্ট পেরিয়ে আরও প্রায় এক ঘণ্টার হাঁটা পথ দূরে। অভিভাবকরা তাদের সন্তানদেরকে অফিসারদের কাছাকাছি কোথাও যেতে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

একদিন ফুতু দেখতে পেলেন, গ্রামে অভিযানের সময় অফিসারদের দ্বারা তোলা একটি ভিডিও ফেসবুকে পোস্ট করা হয়েছে। ঘটনাটি 'তদন্ত' করার জন্য একটি কমিশন দুনসে পাড়ায় আসে। পরে গ্রামবাসীরা জানতে পারে, কয়েকজন অফিসারকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এদের মধ্যে ফুতুর পরিচিত একজন অফিসারও ছিল।

এটা ছিল সেই বিরল ঘটনাগুলোর মধ্যে একটা, যেখানে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের জন্য সামরিক বাহিনী বা পুলিশ নিজেদের কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রামে কিছুই বদলায়নি। ঐ রাতে আটককৃত লোকেরা তখনো নিখোঁজ ছিল। গ্রামবাসীরা জানতে পারে, তাদের মধ্যে একজন পুলিশের হেফাজতে থাকা অবস্থায় মারা গেছে।

গ্রীষ্মকাল এসে পড়লেও আইয়ুব তখনো ছাড়া পাননি। তার পরিবার একজন আইনজীবী রেখেছিল। তিনি তাদেরকে জানান, পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ৩০ আগস্টের মধ্যে তিনি তাকে মুক্ত করতে পারবেন, কিন্তু তাদেরকে ধৈর্য ধরতে হবে।

ফুতু বসন্তকালটি পার করেন প্রাইমারি স্কুল পুনর্নির্মাণের উপর মনোনিবেশ করে। তারা সমস্ত উপকরণ জোগাড় করে ফেলেছিলেন এবং ২০১৭ সালের আগস্টের মধ্যে নতুন ছাদের কাজ প্রায় শেষ করে এনেছিলেন। কিন্তু ঠিক এমন সময় তাদের জীবন আবার ওলট-পালট হয়ে যায়।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জীবন; Image Source: Himaloy Joseph Mree

২৫ আগস্ট গভীর রাতে দুনসে পাড়া এবং চেইন খার লি গ্রামের অধিবাসীরা প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দে একত্রে ঘুম থেকে জেগে ওঠে। চারপাশ থেকে এত বেশি আওয়াজ আসছিল, মনে হচ্ছিল যেন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। সেদিন রাতে ফুতু চেইন খার লি গ্রামে স্কুলের ছাত্রাবাসে ঘুমাচ্ছিলেন। তার স্ত্রী, যিনি কয়দিন আগেই তাদের দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন, ফুতুর ভাইকে বললেন ফোন করে ফুতুর খোঁজ নেওয়ার জন্য। কিন্তু ফোনের নেটওয়ার্ক পাওয়া যাচ্ছিল না। গোলাগুলির আওয়াজ চেইন খার লির দিক থেকেই আসছিল, ফলে তারা ফুতুর জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে শুরু করেন।

গ্রামের লোকেরা ফয়েজ উল্লাহকে দেখতে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি বুঝতে পারছিলেন না তাদের কী করা উচিত। যদিও পাশের গ্রামে গোলাগুলি চলছিল, কিন্তু তারা নিজেদেরকেই প্রবোধ দিচ্ছিল, সামরিক বাহিনী হয়তো দুনসে পাড়ায় নাও আসতে পারে। “আমরা নিরীহ মানুষ,” তারা নিজেরাই পুনরাবৃত্তি করছিল।

চেইন খার লি গ্রামে ফুতু যখন গোলাগুলির শব্দে ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠেন, তখন তার কেবল পরিবারের কথাই মনে পড়ছিল। তার এক বন্ধু তাকে চুপ করে বসে থাকতে বলল, কারণ এই গোলাগুলির মধ্যে রাস্তায় বেরোলেই বিপদ হতে পারে। সময় গড়াতে থাকে, কিন্তু বুলেটের বৃষ্টি আগের মতোই অবিরাম ঝরতে থাকে। তারপরেও ভোরের দিকে ফুতু ঝুঁকি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

ভোরের আলোয় তিনি প্রধান সড়কের উপর নিরাপত্তাবাহিনীকে গোলাগুলিরত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছিলেন। তার উত্তরে, সমুদ্রসৈকত ছিল শান্ত, ঢেউগুলো তীরের কোলে আছড়ে পড়ছিল। ফুতু দৌড়াতে শুরু করলেন। যখন তিনি বাড়িতে এসে পৌঁছলেন, ততক্ষণে তার বাড়ি খালি হয়ে গেছে। ফুতু সবসময়ই দ্রুত এবং সুশৃঙ্খলভাবে চিন্তা করতে পারতেন, কিন্তু ঘর খালি দেখে তিনি ভেঙে পড়লেন। রাজ্যের বিক্ষিপ্ত চিন্তাভাবনা এসে ঘিরে ধরল তাকে: “কীভাবে আমি আমার পরিবারকে খুঁজে বের করব? আমি এখন কী করব? কীভাবে আমি নিজেকে রক্ষা করব?”

ফুতু বড় গ্রামের দিকে ছুটে গেলেন। তিনি আশা করছিলেন, তার পরিবার হয়তো সেখানে তার শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে উঠতে পারে। সেখানে পৌঁছে তিনি অপরিচিত এক মহিলাকে সেই বাড়িতে আশ্রিত অবস্থায় দেখতে পেলেন। কিন্তু মহিলাটি তার স্ত্রী বা তার শ্বশুর-শাশুড়ি কাউকেই দেখেনি।

বুলেট বৃষ্টির সাথে ধীরে ধীরে বজ্রপাতের মতো ভারী অস্ত্র এবং বিস্ফোরণের আওয়াজ যুক্ত হচ্ছিল। ফুতু বাড়ি বাড়ি গিয়ে তার পরিবারের কথা জিজ্ঞেস করতে থাকেন। গ্রামের প্রধান মসজিদে তিনি একদল লোককে পরিকল্পনা করতে দেখতে পেলেন: “যাদের ছোট বাচ্চা আছে তারা পাহাড়ে দিকে চলে যাবে, আর যারা বয়স্ক তারা গ্রামেই থাকবে।” সেখানে কয়েকজন ফুতুকে তার খালার বাড়িতে খোঁজ নিতে বলল। তাদের ধারণা ফুতুর পরিবারকে তারা সেদিকে যেতে দেখেছে।

শেষপর্যন্ত খালার বাড়িতে গিয়ে ফুতু যখন তার বাবা, মা, স্ত্রী এবং শিশুদের সবাইকে একসাথে নিরাপদে দেখতে পান, তখন এক মুহূর্তের জন্য স্বস্তির একটি অনুভূতি ঘিরে ধরে তাকে। সেদিন সকালেই তার পরিবার সেখানে পালিয়ে এসেছিল, কিন্তু তারা বুঝতে পারছিল না কীভাবে ফুতুর

সাথে যোগাযোগ করে তাকে সংবাদ পাঠাবে। ফুতু তার বাবাকে রাস্তায় দেখা ঘটনাগুলোর বর্ণনা দিতে শুরু করেন।

“আমাদের এখন কী করা উচিত?” তার বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

“আমাদের অন্য কিছু করার সুযোগ নেই।” ফুতু সিদ্ধান্ত নিলেন। “আমরা এলাকার মানুষদেরকেই অনুসরণ করব।”

পাহাড়ে যাওয়ার রাস্তাটি এক জায়গায় প্রধান সড়কের সাথে মিলিত হয়েছিল, যার উপর সামরিকবাহিনীর ট্রাকগুলো অবস্থান করছিল। যদিও ট্রাকগুলো চেইন খার লির বাইরে নিশ্চল অবস্থায় বসেছিল, কিন্তু যেকোনো মুহূর্তে সেগুলো এদিকে যাত্রা শুরু করতে পারত। ফুতু এবং তার পরিবার দ্রুত যাত্রা শুরু করার সিদ্ধান্ত নিলো। তারা শুধু আশা করছিল ট্রাকগুলো যেন জীবন্ত হয়ে না ওঠে।

যাত্রা শুরু করার পর প্রথমে ফুতুদের পরিবারের সদস্যরা পাশাপাশি থাকার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু দুই বাচ্চার ভারে তরুণ দম্পতিটির গতি শ্লথ হয়ে আসছিল। ফুতুর স্ত্রী বহন করছিল একেবারে ছোট ছেলেটিকে, আর ফুতুর কোলে ছিল আরেকটু বড়টি।

শতশত মানুষ বর্ষার পানিতে পিচ্ছিল হয়ে থাকা পাথুরে পাহাড়ের উপর দিয়ে ধাক্কাধাক্কি করে এগোনোর চেষ্টা করছিল। কিছুক্ষণ যাওয়ার পরেই ভিড়ের মধ্যে ফুতুদের পরিবারের সদস্যরা একে অন্যের থেকে আলাদা হয়ে গেল। ফুতুর স্যান্ডেল মাটিতে আটকে গেল। তিনি সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। জামাকাপড় বলতে তার কাছে ছিল শুধু একটি লাল টি-শার্ট, একটি ট্রাউজার এবং একটি রেইনকোট।

পাহাড়ের উপরে উঠার জন্য পরিবারগুলো একে অন্যের সাথে লড়াই করেছিল। যে যেভাবে পারছিল, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে মাটি আঁকড়ে ধরে এরপর নিজেকে উপরের দিকে

ঠেলে দিচ্ছিল এগিয়ে যাওয়ার জন্য। অবশেষে যখন তাদের ঊর্ধ্বযাত্রা শেষ হলো, তখন তারা নিচে অবস্থিত গ্রামগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করল। সেখানে চেইন খার লির আকাশজুড়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী এবং লোহিত শিখা একসাথে নাচানাচি করছিল, আর নিচে মাটিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে ছিল মানুষের মৃতদেহ।

দুনসে পাড়াকে জনশূন্য বলে মনে হচ্ছিল। কয়েকজন যুবক সাহস করে খাবারের সন্ধানে চেইন খার লির দিকে যাত্রা করল। তারা ফিরে এলো পোড়া চাল এবং পোড়া লাশের গল্প নিয়ে। অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। ফুতু এবং তার পরিবার পাহাড়ের উপরেই রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিলো। সেখানে পাহাড়ের একটি খাঁজের নিচে প্রায় দুই ডজন মানুষের সাথে তারা আশ্রয় নিলো।

পরদিন সকালে কুয়াশার মতো শান্ত, অপ্রাকৃত এবং স্বর্গীয় একটি পরিবেশ বিরাজ করছিল। দুনসে পাড়ায় ফয়েজ উল্লাহ তখনো আশাবাদী ছিলেন, সামরিক বাহিনী হয়তো সেখানে আসবে না। একদিন কেটে গেল, তারপর দুদিন। ধীরে ধীরে পাহাড়ে আত্মগোপন করা মানুষগুলো ফিরে আসতে শুরু করল। তাদের গ্রামটি হয়তো এবার বেঁচে গেছে।

ফুতু এবং তার পরিবার প্রথমে বোশোরা নামে অন্য একটি গ্রামে গিয়ে সেখানে দুই রাত কাটাল। তারা দোয়া করছিল এই দুর্দিন যেন শেষ হয়ে যায়। তারা কয়েকটি হাঁড়ি, শুকনো মাংস এবং বড় একটি তেরপল জোগাড় করে রেখেছিল, যদি আবার তাদেরকে পালাতে হয় তার প্রস্তুতি হিসেবে।

২৮ আগস্ট ভোরবেলা নিরাপত্তাবাহিনী গুলি চালাতে চালাতে দুনসে পাড়া এবং বোশোরায় প্রবেশ করল। গ্রামবাসীরা হঠাৎ করেই বুঝতে পারল, তারা কখনোই নিরাপদ ছিল না। ফুতু এবং তার পরিবার আবারও পালাতে শুরু করল। তারা তাদের পেছন থেকে বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল। তারা আবারও পাহাড় বেয়ে উঁচু থেকে উঁচুতে উঠে গাছের নিচে আশ্রয় নিলো।

দুনসে পাড়ায় তখনও যারা রয়ে গিয়েছিল, সামরিকবাহিনী প্রবেশ করার পর তারাও একই পথ ধরে পালাতে শুরু করলো। ফয়েজ উল্লাহর পরিবার তাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। তারা যখন

দৌড়াচ্ছিল, তখন একটি গুলি এসে পেছন থেকে ফয়েজ উল্লাহর শরীর ভেদ করে চলে গেল। তিনি খুন হলেন তাদের হাতে, যাদেরকে তিনি সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করছিলেন। তিনি মারা গেলেন তাদের সামনে, যাদেরকে তিনি আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করছিলেন।

পরিস্থিতি এতই বিশৃঙ্খলাময় ছিল, এতই আকস্মিক ছিল যে, মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে ছেড়ে দিয়েছিল। বয়স্ক দাদা-দাদীরা, যারা দৌড়াতে পারছিল না, তাদেরকে ছেড়ে তারা নিজেরা পালাতে শুরু করেছিল। পেছনে ফেলে যাওয়া এই মানুষগুলো পুড়ে মারা গিয়েছিল তাদের নিজেদের হাতে নির্মিত বাড়িগুলোর ভেতরেই। এক মায়ের মৃতদেহের সন্ধান মিলেছিল নৌকার ভেতর, যাকে সেখান পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তার লাশ পুড়ে কয়লা হয়ে গিয়েছিল, এরপরও সেটিকে টুকরো টুকরো করে কাটা হয়েছিল।

পাহাড়ের উপর থেকে ফুতু তার পৃথিবীকে ছাই হয়ে যেতে দেখলেন, ঠিক যেমন নিরাপত্তাবাহিনীর অফিসাররা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। ফুতু নিচে আধ ডজনের মতো গ্রাম দেখতে পাচ্ছিলেন। সবগুলো গ্রাম ছিল উজ্জ্বল লোহিত শিখার উপরে ঘন কালো ধোঁয়ার আস্তরণ দ্বারা আবৃত।

ফুতুর মনে পড়ল তার স্কুলটির কথা, যে স্কুলটি তিনি নিজ হাতে তৈরি করেছিলেন; তার বই এবং সংবাদপত্রগুলোর কথা, যেগুলো তিনি পড়েছিলেন এবং সংগ্রহ করেছিলেন; তার ডায়েরিগুলোর কথা, যেগুলো তিনি লিখেছিলেন। তার মনে পড়ল তার সংগৃহীত জ্ঞান, গল্প এবং প্রমাণগুলোর কথা, যেগুলো তিনি যত্নের সাথে তিলে তিলে জড়ো করেছিলেন এই বিশ্বাসে যে, সেগুলো টিকে থাকবে তার মৃত্যুর পরেও; তিনি নিখোঁজ হলেও কিংবা তাকে গুলি করে হত্যা করা হলেও।

এক রোহিঙ্গা স্কুলশিক্ষক এবং তার গণহত্যার ডায়েরি (৮ম পর্ব)

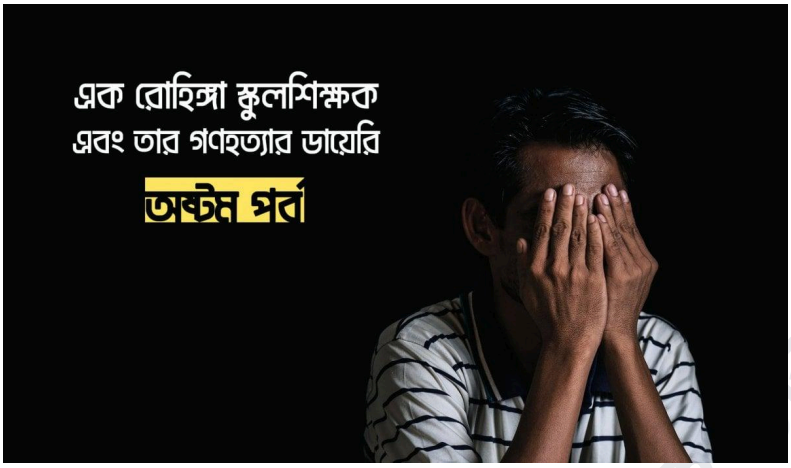

২৫ আগস্ট ভোরবেলায় সমগ্র রাখাইন রাজ্যজুড়ে চেকপোস্টগুলোতে আরসা একযোগে ৩০টি হামলা চালিয়েছিল। কিন্তু প্রতিক্রিয়ায় সরকার জঙ্গিদের সাথে বেসামরিক জনগণের কোনো পার্থক্য করেনি। মনে হচ্ছিল কর্তৃপক্ষ যেন এরকম কোনো অজুহাতের অপেক্ষাতেই ছিল। কয়েক মাস ধরেই সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করা হচ্ছিল। কমপক্ষে ২৭টি আর্মি ব্যাটেলিয়নের সাথে বিজিপি এবং বেসামরিক রাখাইন মিলিশিয়ারা যোগ দিয়ে এলাকা থেকে সবাইকে উচ্ছেদ করতে শুরু করে।

সেনাবাহিনী মুসলিমবিদ্বেষী চরম উগ্রপন্থী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পরামর্শে ফেসবুকে রোহিঙ্গাবিরোধী অপপ্রচার চালাতে শুরু করে। ফলে গণহত্যা ছড়িয়ে পড়তে থাকে তরঙ্গের মতো। কমপক্ষে ১০,০০০ নারী, পুরুষ এবং শিশুকে হত্যা করা হয় – ছুরিকাঘাতে, শিরশ্ছেদ করে, টুকরো টুকরো করে, আগুন ধরিয়ে দিয়ে, গুলি করে। বাচ্চাদেরকে তাদের মায়েদের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়। অনেক বাচ্চাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়। মহিলাদেরকে অপহরণ করে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়, তাদেরকে কামড়ে, গণধর্ষণ করে, তাদের স্তন কেটে ফেলা হয়, এরপর তাদের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। (কোয়ে তান কাউক গ্রামের রাখাইন প্রশাসক ইউ তিন থিন সোয়ে এগুলো অস্বীকার করেন। তিনি দাবি করেন, সন্ত্রাসী রোহিঙ্গারা তাদের নিজেদের বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে।)

কয়েকদিন পর্যন্ত পাহাড়ে বিভ্রান্তি এবং গুজব মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। পরিবারগুলো নিরাপদ মনে করে সেদিকে যাত্রা শুরু করেছিল, কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর রাস্তার পাশে ধ্বংসস্তূপ দেখে কিংবা নতুন কোনো চেকপোস্টের মুখোমুখি হয়ে তাদেরকে আবার উল্টোদিকে ফিরে আসতে হয়েছিল। সর্বত্র মানুষের শরীর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে ছিল। কিছু জীবিত, কিছু মৃত। মানুষজনকে দেখা না গেলেও গাছের আড়াল থেকে তাদের কথোপকথনের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল।

রাতের বেলা যুবকরা একত্রিত হলো পরিকল্পনা করার জন্য। তারা গ্রামে থেকে ঘুরে আসতে চায়। খাবার খুঁজে আনার জন্য, তাদের মৃতদেরকে কবরস্থ করে আসার জন্য। ফুতু চেয়েছিলেন তাদের সাথে যোগ দিতে এবং তার ডায়েরিগুলো খুঁজে বের করে আনতে, কিন্তু তার বাবা তাকে নিষেধ করলেন "আমাদেরকে যদি মরতে হয়, তাহলে আমরা এখানেই না খেয়ে মরব। মরার জন্য তোমার নিচে নামার দরকার নেই।"

পঞ্চম রাতে নতুন একটি গুঞ্জন শোনা গেল- শীঘ্রই সেনাবাহিনী পাহাড়ে অভিযান চালাবে। সাথে সাথে সবাই বাংলাদেশের দিকে পালাতে শুরু করল। ফুতু এবং তার পরিবার অন্যদের পেছন পেছন সারা রাত কাদামাটির উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে পরের দিন সকালে ছোট একটা নদী পার হলো। শেষপর্যন্ত তারা যখন বিশাল নাফ নদীর সাদা বালুকাময় সৈকতে এসে পৌঁছাল, তখন সেখানে অগণিত মানুষ ভিড় করছিল। ফুতুর জীবনে দেখা বাজারের সবচেয়ে বড় ভিড়ও এর তুলনায় নগণ্য ছিল। মানুষ সমুদ্রতীরের বালিতে তেরপলের তাঁবু টানাচ্ছিল, তাদের সাথে যে অল্প কিছু জিনিসপত্র ছিল, সেগুলোই বালির উপর ছড়িয়ে রাখছিল।

মাঝিরা শরণার্থীদেরকে নিয়ে এপার থেকে ওপারে আসা-যাওয়া করছিল। ফুতু নিকটবর্তী বাংলাদেশি তীরে যেতে চাইছিলেন না। তার আশঙ্কা ছিল, বাংলাদেশ সরকার হয়তো এখানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে দিতে পারে কারা প্রবেশ করতে পারবে, কারা পারবে না। ফলে তারা হয়তো পানির উপর আটকা পড়ে যেতে পারেন।

ফুতু চাইছিলেন বাংলাদেশের আরও গভীরে, কক্সবাজারের প্রধান সমুদ্রবন্দর দিয়ে সেখানে প্রবেশ করতে। মাঝি যখন অতিরিক্ত ভাড়া চাইল, তিনি দরদামের ঝামেলায় না গিয়ে রাজি হয়ে গেলেন। সেদিন রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত শুরু হলো। ফুতু তার জীবনে কোনোদিন এরকম বৃষ্টিপাত দেখেননি। চৌদ্দ ঘণ্টা পর, তারা গ্রাম ছেড়ে পালানোর ১৩ দিনে পর, ২০১৭ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর, তাদের নৌকাটি কক্সবাজার সমুদ্রবন্দরের বুক সমান উঁচু পানিতে গিয়ে থামল। ফুতু তার মা ও স্ত্রীকে নিয়ে বাংলাদেশের উপকূলে নেমে এলেন।

ফুতুর পরিবার ছিল বাংলাদেশে পৌঁছা ৭০০,০০০ রোহিঙ্গার মধ্যে একটি পরিবার। এটি ছিল বিশ্বের সাম্প্রতিক ইতিহাসে শরণার্থীদের সবচেয়ে বড় স্রোত। তারা একটি প্রধান সড়কের ধারে তাদের তেরপলের টুকরোকে তাঁবুর মতো করে টানিয়ে সেখানে রাত কাটান। তৃতীয় দিন সকালে বাংলাদেশি সামরিক বাহিনী তাদের সবাইকে রাস্তা ছেড়ে ঘন জঙ্গলের ভেতর চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। তারা গাছপালার ভেতর দিয়ে নিজেদের ক্লান্ত শরীরগুলোকে টেনে নিয়ে যেতে থাকেন। সেখানে তারা এমনভাবে বিশ্বের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ শরণার্থী শিবির গড়ে তোলেন যে, মনে হচ্ছিল কেউ যেন রাতারাতি ঘন জঙ্গল সাফ করে ফেলেছে।

কর্দমাক্ত পাহাড়ের উপর বাঁশ এবং তেরপলের তৈরি খুপরির পর খুপরি গজিয়ে উঠতে থাকে। তাদের ওজনে পাহাড়ের মাটি ধ্বসে পড়ার উপক্রম হয়। বর্ষাকালে ভূমিধ্বসের ঘটনা ঘটে। নতুন আগত শরণার্থীরা পৃথিবীর বুকে ছোট এক টুকরো জায়গা খুঁজে পেতেও হিমশিম খাচ্ছিল। জঙ্গলের ভেতর গড়ে উঠা শরণার্থী শিবিরে বিপন্ন এশীয় হাতিদের চলাচলের রাস্তাগুলো বিপন্ন মানবজাতির দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। হাতির আক্রমণে তাঁবুগুলো পদদলিত হয়ে ১৩ জন শরণার্থী নিহত এবং কয়েক ডজন আহত হয়।

সেই উত্তাল প্রথম সপ্তাহে এক রাতে ফুতু নতুন একটি ডায়েরি লিখতে শুরু করেন। তিনি যতটা যত্নের সাথে সম্ভব, যা কিছু ঘটেছে তা লেখার চেষ্টা করেন- তাদের গ্রাম ছেড়ে পালানোর তারিখ, পাহাড়ের বুকে রাত কাটানোর ঘটনা- কিন্তু তিনি টের পান, তার স্বাভাবিক সুস্থির মস্তিষ্ক কাজ করছে

না। তার চিন্তাভাবনাগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে: এই ঘটনা কি অমুক তারিখে ঘটেছিল, নাকি অন্য কোনো তারিখে? মৃত্যু, অগ্নিশিখা এবং সহিংসতার দৃশ্যগুলো তার পরিষ্কার মনে পড়ছিল, কিন্তু ঘটনার বিস্তারিত এবং তারিখগুলো ঝাপসা হয়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল তার মস্তিষ্ক যেন স্মৃতিগুলোকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেনি। তিনি এক সপ্তাহ ধরে ঘটনাগুলোর খসড়া তৈরি করেন। একবার শুরু করে আবার থেমে যান, তারপর আবার শুরু করেন।

দুনসে পাড়ার সবাই যেহেতু প্রায় একই সময়ে পালিয়ে এসেছিল, তাই শিবিরের ভেতর তাদের সবার প্রায় একই অংশে স্থান হয়েছিল। বলা যায় পুরো একটি গ্রাম এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। কর্দমাক্ত পথে যতবারই ফুতুর সাথে পরিচিত কারো দেখা হতো, ততবারই তিনি তাদের পরিবার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতেন। তিনি জিজ্ঞেস করতেন, তাদের কতজন আত্মীয় আহত হয়েছে, কেউ মারা গেছে কি না। তাদের পরিবারের সবাই বেঁচে থাকলে এরপর তিনি তাদের প্রতিবেশীদের কথা জিজ্ঞেস করতেন।

একদিন ফুতু সিদ্ধান্ত নিলেন, তাকে নতুন একটি ডকুমেন্ট তৈরি করতে হবে। এর আগে একবার তিনি তার গ্রামের মানুষদের জীবনের মানচিত্র তৈরি করেছিলেন, এবার তিনি তাদের মৃত্যুর তালিকা লিপিবদ্ধ করতে শুরু করলেন। তিনি ইংরেজিতে লেখা শুরু করলেন, শিরোনাম দিলেন 'মৃতদের তালিকা'। প্রতিটি নামের সাথে একটি করে মুখের ছবি তার মনের পর্দায় ভেসে উঠছিল।

শেষপর্যন্ত তার তালিকায় ১২টি নাম স্থান পেয়েছিল। ফুতুর মনে হলো তিনি ভাগ্যবান যে, তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন। তিনি ভাগ্যবান যে, তাকে তার নিজের পরিবারের কোনো সদস্যের নাম লিখতে হয়নি। কিন্তু নিহতের সবাইকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন- মায়েদেরকে, তাদের সন্তানদেরকে, শিশুদেরকে। ফুতু ইতিহাস ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। ইতিহাসের গতিপথ ধরে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ফুতুর সাথে আমার (মূল লেখক Sarah A. Topol-এর) দেখা হয়েছিল আগস্টের সেই হত্যাকাণ্ডের এক বছর পরের এক বিকেলে, ক্যাম্পগুলোর পাশে অবস্থিত সবচেয়ে বড় লোহার ব্রিজটির পাশে। ব্রিজটি নির্মিত হয়েছিল জাপান সরকারের অনুদানে। সেখানে খোদাই করে লেখা ছিল, "জাপানের জনগণের পক্ষ থেকে"।

২০১৭ সালের গ্রীষ্মকালে বিশ্ববিবেককে কাঁপিয়ে দেওয়া সংবাদগুলো ছিল মানুষের দুর্দশাকে পুঁজি করে এক ধরনের অশ্লীল ব্যবসা। জাতিসংঘের একটি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন মায়ানমারের সামরিক কমান্ডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং গণহত্যার অভিযোগ তুলেছিল। কিন্তু যারা রোহিঙ্গাদের দুর্দশার সংবাদ রাখছিল, তারা জানত আগস্টের সেই ঘটনাটি ছিল অবধারিত।

রোহিঙ্গারা এমন একটি দেশে দিনের পর দিন বাস করত, যে দেশের মানুষ তাদেরকে চায়নি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তাদেরকে ঋতু পরিবর্তনের মতো বারবার দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছিল। এক বৃদ্ধের সাথে আমার দেখা হয়েছিল, যিনি এ পর্যন্ত চারবার শরণার্থী হয়েছেন। কীভাবে তিনি প্রতিবার ফিরে গিয়েছিলেন? কীভাবে তিনি প্রতিবার নতুন করে তার জীবন শুরু করতে

পেরেছিলেন এবং আশা করেছিলেন যে, এবার তার পরিণতি ভিন্ন কিছু হবে? কীভাবে মানুষ দিনের পর দিন ধার করা সময়ে বেঁচে থাকে?

দুনসে পাড়ায় কী ঘটেছিল সেটা বোঝার জন্য একজন অনুবাদকের সাহায্য নিয়ে আমি দুই শয়েরও বেশি মানুষের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। সে সময়ই আমি এই সম্প্রদায়ের সবচেয়ে জ্ঞানী সদস্য হিসেবে ফুতুর নাম জানতে পেরেছিলাম। অথচ তার বয়স তখন ত্রিশও পেরোয়নি। তিনি আমাকে অনুরোধ করেছিলেন তার নাম প্রকাশ না করার জন্য। যদি দুনসে পাড়ায় ফিরে যেতে হয়, তাহলে প্রতিশোধের হাত থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য তিনি তার শৈশবের ডাক নামটি আমাকে ব্যবহার করতে বলেছিলেন।

ফুতুর বলা কাহিনীগুলো খরস্রোতা জলধারার মতো বারবার হোঁচট খাচ্ছিল। প্রায়ই আমি যেসব ঘটনা জানতে চাইতাম, তিনি আরো কয়েক বছর আগের ঘটনা থেকে সেগুলোর বর্ণনা শুরু করতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তিনি তার কাহিনী ব্যাখ্যা করে যেতেন। দিনের বেলা ফুতু কাজ করতেন, আর সন্ধ্যার পরে বিদেশিদের ক্যাম্পগুলোতে থাকার অনুমতি ছিল না। কাজেই আমরা সাক্ষাৎ করতাম তার কর্মস্থলে, তার বস্তিতে এবং তার পরিবারের সদস্যদের খুপরিতে। যখনই সুযোগ পেতাম, তার ব্যস্ততার মধ্যে থেকে আমরা কিছুটা সময় ছিনিয়ে নিয়ে কাজে লাগাতাম।

অন্য যাদের সাথে আমি কথা বলেছিলাম, তারা নিজেদের সম্প্রদায়কে বর্ণনা করতে গিয়ে ‘দুর্দশাগ্রস্ত,’ ‘করুণ’ এবং ‘হতভাগ্য’ শব্দগুলো ব্যবহার করত। কিন্তু ফুতু কখনো এভাবে কথা বলতেন না। তিনি মায়ানমারে বসবাস করতেন এই বিশ্বাসে যে, যথেষ্ট পরিমাণে চেষ্টা করলে পরিবর্তন আনা সম্ভব। তার এই বিশ্বাস এই কারণে গড়ে উঠেনি যে, এ ব্যাপারে তার বিশাল কোনো পরিকল্পনা ছিল। যদিও এটা সত্য যে, তার আসলেই বিশাল কিছু করার পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু তার এই বিশ্বাস মূলত গড়ে উঠেছিল এই কারণে যে, শেষপর্যন্ত এছাড়া তার অন্য কোনো বিকল্প ছিল না।

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির; Image Source: Adam Dean/New York Times

শরণার্থী শিবিরের জীবন ছিল একইসাথে মায়ানমারের জীবনের তুলনায় ভালো এবং খারাপ। তাদের গ্রামের মতো এখানে তাদেরকে সারাক্ষণ মৃত্যুর ভয় তাড়া করে ফেরে না, রাতের বেলা তারা নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে। কিন্তু তারা ক্যাম্পগুলোর বাইরে কোথাও যেতে পারে না, সীমানার বাইরে ভালো হাসপাতালে যেতেও তাদেরকে অনুমতি নিতে হয়। তাদের সম্প্রদায়ের বাইরের বাহিনীরা এখানে তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে।

মায়ানমার এবং বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের জন্য আলোচনা করছে। অনেক রোহিঙ্গা বলছে, তারা আনুষ্ঠানিক জাতিগত স্বীকৃতি ছাড়া ফিরে যাবে না। কিন্তু আলোচনার জন্য তাদের নির্বাচিত কোনো নেতা বা প্রতিনিধি নেই। ওদিকে আরসা ক্যাম্পগুলোতে তাদের উপস্থিতি জাহির করছে এবং যারা তাদের বিরুদ্ধে কথা বলছে তাদের মৃত্যুদণ্ড অব্যাহত আছে। জাতিসংঘের

শরণার্থী সংস্থা মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু কে জানে এই জায়গাটিও কবে আবার রোহিঙ্গাদেরকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়!

বাংলাদেশ রোহিঙ্গা ছেলেমেয়েদেরকে সরকারি স্কুলে ভর্তি হওয়ার অনুমতি দেওয় না। ইউনিসেফ 'চাইল্ড-ফ্রেন্ডলি স্পেসেস' প্রতিষ্ঠা করেছে, কিন্তু শিশুরা সেখানে যায় মূলত খেলতে এবং ছবি আঁকতে, পড়াশোনা শিখতে না। দাতব্য সংস্থাগুলোও কিছু 'শিক্ষণ কেন্দ্র' স্থাপন করেছে, কিন্তু কোনো নির্ধারিত পাঠ্যক্রম ছাড়াই। সেগুলোর অকার্যকারিতা নিয়ে ফুতু প্রায়ই ঠাট্টা করেন।

কিছু প্রাইভেট টিউটরিং স্কুল আত্মপ্রকাশ করেছে। উদ্বাস্তু হিসেবে ফুতু যেরকম স্কুলে অংশ নিয়েছিলেন, অনেকটা সেরকম। কিন্তু সেগুলোতে কেবল প্রাথমিক গণিত এবং ভাষাই শেখানো হয়; ইতিহাস, বিজ্ঞান কিংবা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অন্য কোনো বিষয় শেখানো হয় না। সেগুলোতে দিনে মাত্র এক ঘণ্টা ক্লাস চলে। পুরো একটি প্রজন্ম যেন কবরস্থানে বসবাস করছে। এখনও তারা বার্মিজ শিক্ষা ব্যবস্থাই অনুসরণ করছে, এই আশায় যে, একদিন তাদের পরিস্থিতি বদলে যাবে এবং তারা তাদের দেশে ফিরে যাবে।

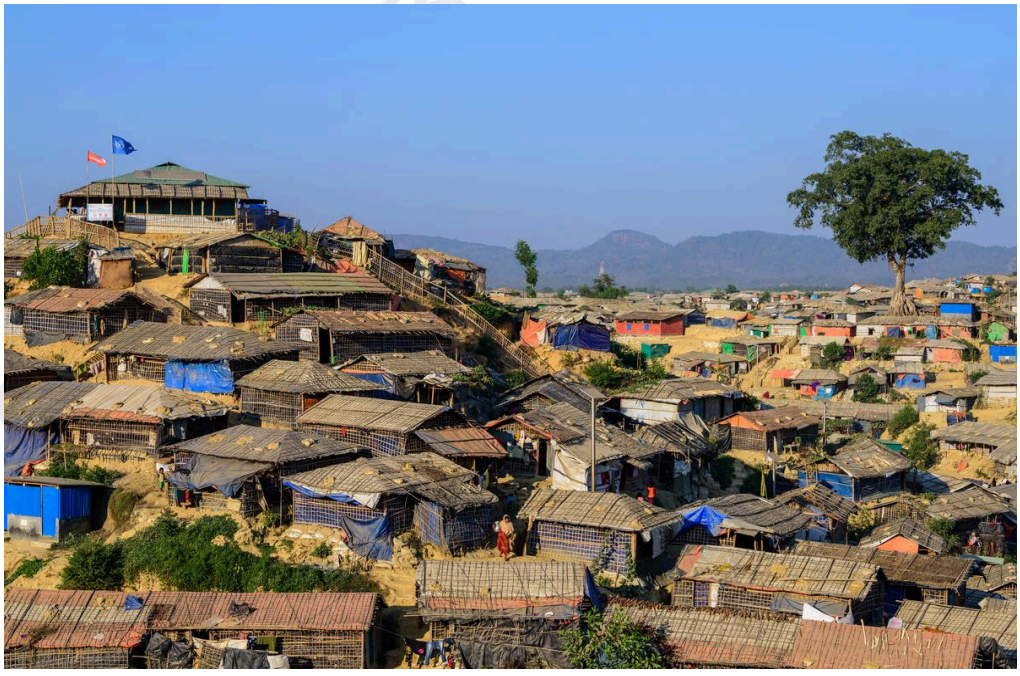

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির; Image Source: Jon Warren

দিনের পর দিন ফুতু টিকেছিলেন, এবং বলা যায় তিনি উন্নতি করছিলেন। তিনি স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের হয়ে কাজ শুরু করেছিলেন এবং পদোন্নতি পেয়ে একটি এইড বিতরণ সাইটের পরিচালক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু তিনি শিক্ষকতা বন্ধ করে দিয়েছেন, ডায়েরি লেখা ছেড়ে দিয়েছেন।

এখনো মাঝে মাঝে তিনি তার মোবাইল ফোনে কিছু কিছু ঘটনার দিন-তারিখ লিখে রাখেন, যেমন রেড ক্রসের প্রতিনিধিদের একটি আন্তর্জাতিক কমিটির শরণার্থী শিবির পরিদর্শন, কিংবা পরিচিত কোনো শিশুর জন্ম, কিন্তু প্রতি রাতে তিনি যেভাবে ইতিহাসের মতো করে দিনপঞ্জি লিখে রাখতেন, সেটা বন্ধ হয়ে গেছে।

তিনি আমাকে বলেছিলেন, এর কারণ ছিল ক্যাম্পের ভিড় এবং আর্দ্রতা। তার চিন্তাভাবনাগুলোকে গুছিয়ে আনার মতো পরিবেশ সেখানে ছিল না। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছিল, এর পেছনে কি অন্য কিছু আছে? তার এই জীবনে কি এমন কিছু আছে, যা তিনি লিপিবদ্ধ করতে চান না?

এ পর্যন্ত আমরা যতবার কথা বলেছি, ফুতু শুধু আমার কাছে একটা বিষয়ই জানতে চেয়েছেন: রোহিঙ্গাদের কী হবে বলে আমি মনে করি? আমি তাকে বলেছি, আমি জানি না। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, দুনসে পাড়ায় ফিরে যাওয়ার বিষয়ে তিনি কী ভাবছেন? তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন, তিনি তার অধিকার নিয়ে ফিরে যাওয়ার বেশি আর কিছুই চান না। আরেকদিন তিনি জানালেন, তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, স্বীকৃতি ছাড়া ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে তিনি বরং সমুদ্রে ডুবে মারা যাবেন।

আমি জানতে পেরেছিলাম, বার্মিজ সরকার দুনসে পাড়ার জমিতে একটি মডেল গ্রাম তৈরি করছে, যে গ্রামটিতে এখন পোড়া গাছের গুঁড়ি আর পরিত্যক্ত মাঠ ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই। আমি যখন ফুতুকে সংবাদটা দিলাম, তিনি আমাকে জানালেন, তিনিও এটা শুনেছেন, কিন্তু বিশ্বাস করেননি। তাদেরকে তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে সেটা পরিপূর্ণভাবে দখল করে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাটা তার কাছে অনেক বেশি অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছিল।

৯ অক্টোবর এবং ২৫ আগস্টের ঘটনাগুলো প্রায়ই ঘুরেফিরে ফুতুর মনে পড়ে। ঘুমাতে গেলে তিনি শুধু তার বাবাকেই স্বপ্নে দেখেন, যিনি কয়েক মাস আগে মারা গিয়েছিলেন। তাকে কবর দেওয়া হয়েছিল শরণার্থী শিবিরের কবরস্থানে, যে দেশ থেকে তিনি এসেছিলেন, সেখান থেকে অনেক অনেক দূরে। "সবাইকে একদিন মারা যেতে হবে" ফুতু আমাকে বলেছিলেন। "আমাকেও মরতে হবে। আমি এটা মেনে নিয়েছি। কিন্তু যে কষ্টের মধ্য দিয়ে আমরা গিয়েছি, সেটা আমি মেনে নিতে পারছি না। সেটা ভুল যাওয়ার জন্য আমি আমার মনকে রাজি করাতে ব্যর্থ হয়েছি।"

এক রোহিঙ্গা স্কুলশিক্ষক এবং তার গণহত্যার ডায়েরি (শেষ পর্ব)

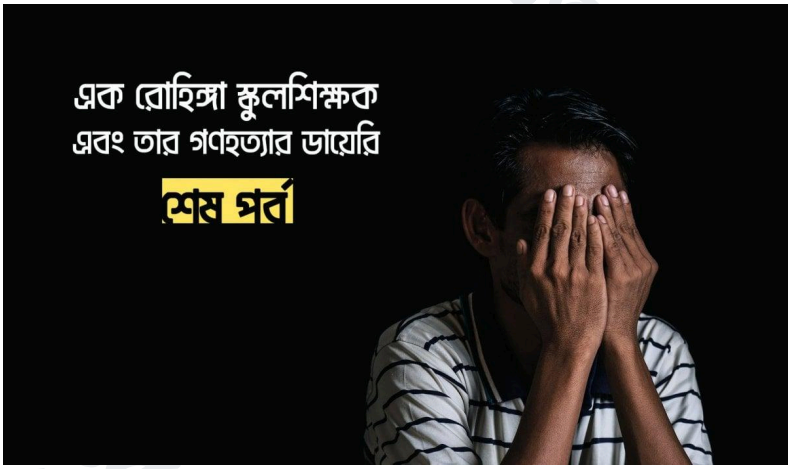

শরণার্থী শিবিরে আমার শেষ রাতে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে ফুতু তার বাঁশের তৈরি কুটিরের ভেতর বসেছিলেন। রাত ৮টার মতো বাজছিল তখন। কার্ফিউর সময় আরো আগেই পেরিয়ে গিয়েছিল। অন্ধকার ডানা মেলে কুটিরের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছিল। একটা মাত্র সোলার-পাওয়ারের লাইট বাল্বের আলোর সামনে তার একটা ছায়ামূর্তির অবয়ব ফুটে উঠেছিল।

ফুতুর ভেতরে কিছু একটা ঘটে গিয়েছিল। আমি আজও জানি না ঠিক কী ঘটেছিল, কিন্তু ফুতু, যিনি সব সময়ই ছিলেন একজন আশাবাদী মানুষ, যিনি নিষ্ঠার সাথে অভীষ্ট লক্ষ্যে কাজ করতে পছন্দ

করতেন, হঠাৎ করেই তিনি যেন ভেঙে পড়লেন। কুটিরের ভেতর তার আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবেশীরা সবাই উপস্থিত ছিল। তাদের সামনে তিনি নিজের জীবনকে যাচাই করতে শুরু করলেন।

"এটাই কি জীবন, যার জন্য কেউ অপেক্ষা করবে? কেন কাউকে এরকম কষ্টকর জীবন যাপন করতে হবে?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন। "আমার বাচ্চারা, আমার বাবা ... আমার বাবা মারা গেছেন, আমার দাদা মারা গেছেন। কিন্তু কিছুই পরিবর্তিত হয়নি। এবার আমার পালা। আমার দুটি সন্তান আছে। এখনই সময়, আমাকে আমার সন্তানদের ভরণপোষণ করতে হবে। আমি আর সন্তান নিতে চাই না। এটা চিন্তা করাও অর্থহীন। আমরা এখানে শুধু বেঁচে থাকার চেষ্টা করছি। এবং ভবিষ্যতে আমার কী হবে সেটাও আমি জানি না। এ নিয়ে চিন্তা করতে গেলেই আমার মাথায় জট পাকিয়ে যায়। আমি কত কিছু করতাম। সে সময় আমি শিক্ষার প্রচারে খুব আগ্রহী ছিলাম, কিন্তু এখন আমি সেগুলো নিয়ে ভাবতে চাই না। আমার মন এখন খুবই অশান্তিতে আছে।"

ফুতু বসেছিলেন তার হাঁটুর উপর ভর দিয়ে। তার মুখে ছিল যন্ত্রণার চিহ্ন। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে "সিস্টার" বলে সম্বোধন করলেন, যেটা তিনি আমাদের পরিচয়ের এক সপ্তাহ পর থেকেই শুরু করেছিলেন।

বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের শরণার্থী শিবিরে একটি স্কুল; Image Source: Adam Dean/New York Times

তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপা, আপনার বাবা-মা আপনাকে ভালো পড়াশোনা করিয়েছেন, আপনার শিক্ষার জন্য তারা নিজেরা কষ্ট করেছেন, আপনাকে বিশেষজ্ঞ বানানোর জন্য নিজেদের কষ্টে উপার্জিত অর্থ ব্যয় করেছেন। এখন আপনি সেই বিশেষ জ্ঞান কাজে লাগাচ্ছেন আপনার আত্মীয়স্বজনকে, আপনার দেশকে, কিংবা হয়তো অন্যান্য দেশকেও সাহায্য করার জন্য। যদি কেউ তার জ্ঞান কাজে লাগানোর জন্য এরকম সুযোগ না পায়, তাহলে এই কঠোর পরিশ্রমের, সারা জীবন ধরে বাবা-মায়ের এই কষ্টের কী মানে আছে?"

"আমার বাবা-মা আমার পড়াশোনার জন্য কষ্ট করেছেন। যদি তারা না করতেন, তাহলেই বরং আরো ভালো হতো। আমি সমস্ত ঝামেলা এবং মারধর থেকে বেঁচে থাকতে পারতাম। ব্যাপারটা এরকমই, আপা। যদি কেউ মারা যায়, তাহলে সেখানেই শেষ। যদি আমরা মারা যাই... অনেক মানুষ মারা গেছে... তাহলে সবকিছু সেখানে শেষ হয়ে যেত। তার পরিবর্তে আমরা আমাদের জীবন নিয়ে এখানে পালিয়ে এসেছি। মাঝে মাঝে আমি যখন এগুলো নিয়ে চিন্তা করি, আমার খুবই কষ্ট লাগে। আমার মনে চায় সবকিছু ছেড়ে দিই।"

বাংলাদেশের ক্যাম্পগুলোতে আমি এক মাস ধরে ধর্ষণ এবং ধ্বংসযজ্ঞের কাহিনী শুনে কাটিয়েছিলাম, কিন্তু সেগুলোর কিছুই আমাকে মানুষের মনের গণহত্যার জন্য প্রস্তুত করতে পারেনি। গণহত্যার পরেও একটি জাতি টিকে থাকতে পারে; যারা বেঁচে যায় তারা নতুন করে জীবন গঠন করতে পারে। কিন্তু যখন একটি জাতির আত্মপরিচয় তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়, তখন কী ঘটে? যখন বছরের পর বছর ধরে তাদেরকে পৃথিবী থেকে বারবার মুছে ফেলা হয়? যখন প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তাদেরকে বলা হয় যে, তাদের অস্তিত্ব নেই? এবং কী ঘটে, যখন তাদের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবীরা হাল ছেড়ে দেয়, লেখা বন্ধ করে দেয়, শিক্ষকতা বন্ধ করে দেয় এবং চিন্তাভাবনা বন্ধ করে দেয়? এটাই কি বার্মিজ সরকার শুরু থেকে চেয়ে আসছিল?

সেই রাতে বেরিয়ে যাওয়ার আগে আমি ফুতুকে একটি উপহার দিয়েছিলাম। একটি নোটবুক। আমি ভেবেছিলাম যদি তিনি কখনও অনুপ্রেরণা খুঁজে পান, তাহলে হয়তো তিনি এটাকে ডায়েরি হিসেবে

ব্যবহার করতে পারবেন। আমাদের বিদায় ছিল গুরুগম্ভীর এবং বেমানান। ফুতু আমাকে বলেছিলেন, তিনি নিশ্চিত যে তারা যদি ফিরে যান তাহলে তাদের সবাইকে মেরে ফেলা হবে।

আমরা হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ রেখেছিলাম। শরণার্থী শিবিরের নেটওয়ার্ক ছিল খুবই খারাপ। তারপরেও ফুতু যখন সিগন্যাল পেতেন, তখন মাঝে মাঝে আমার সাথে তার যোগাযোগ হতো। আমি চলে যাওয়ার পর একদিন তিনি আমাকে ম্যাসেজ পাঠিয়ে জানালেন, তিনি আবার ডায়েরি রাখতে শুরু করেছেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, তার স্বপ্ন পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ জমিয়ে তিনি একদিন একটি কম্পিউটার কিনবেন।

কয়েক সপ্তাহ পর তিনি আবার আমাকে ম্যাসেজ পাঠালেন। তিনি জানালেন, তিনি একটি নতুন প্রকল্পের সাথে যোগ দিয়েছেন, ক্যাম্পগুলোতে বৃক্ষরোপণ প্রকল্প- ভূমিধ্বস রোধে সহায়তা করার জন্য, পৃথিবীতে শেকড় দৃঢ় করার জন্য। এর কয়েক সপ্তাহ পর তিনি আবারও ম্যাসেজ পাঠালেন, এবার তিনি অন্যান্য সম্প্রদায়ের নেতাদের সাথে মিলে একটি নতুন স্কুল খোলার জন্য কাজ শুরু করছেন। এই স্কুলে তারা বার্মিজ, ইংরেজি এবং গণিত শেখাবেন। তাদের লক্ষ্য এক হাজার শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছা।

ডিসেম্বর মাসে তারা স্কুলটি নির্মাণ শেষ করেছিলেন- নীল রঙের তেরপল দিয়ে ঘেরা বাঁশের তৈরি বড় একটি আশ্রয়কেন্দ্র। জানুয়ারির মধ্যে এটার মেরামতের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ফুতু ব্যাখ্যা করেছিলেন, তাদের কাছে যথাযথভাবে স্কুল নির্মাণের জন্য যথেষ্ট অর্থ ছিল না। তারা শিক্ষার্থীদের বাবা-মায়েদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করছিলেন, কিন্তু শরণার্থীদের নিজেদেরই কোনো চাকরি ছিল না, পড়াশোনার পেছনে জন্য অর্থ খরচ করার মতো তাদের সত্যিকারের কোনো আয় ছিল না।

ভূমিধ্বস রোধের প্রকল্পটি এগিয়ে গিয়েছিল। ফুতু প্রায়ই আমাকে গাছ এবং চারার ছবি পাঠাতেন। তিনি আমাকে তার বাবাকে নিয়ে দেখা স্বপ্নগুলোর কথা জানিয়ে মেসেজ পাঠাতেন। কখনো কখনো তারা বার্মিজ সামরিক বাহিনীর কাছ থেকে ছুটে পালাতেন; কখনো কখনো তারা কেবল তাদের জীবন নিয়ে কথা বলতেন।

ফুতু আমাকে সবচেয়ে বেশি মেসেজ পাঠাতেন তার ডায়েরিগুলো নিয়ে তার দুঃখের কথা জানিয়ে, তার অতি যত্নে সংগ্রহ করা ইতিহাসের ধ্বংসের কথা জানিয়ে। তিনি এই আর্টিকেলটি সম্পর্কেও প্রায়ই জিজ্ঞেস করতেন। তিনি জানতে চাইতেন, রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে আমেরিকানরা কী ভাবে? তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, তিনি এই ম্যাগাজিনের একটি কপি স্পর্শ করতে পারবেন কি না। তিনি আমাকে বারবার অনুরোধ করেছিলেন, যেন আমি এর একটা কপি তাকে পাঠাতে ভুলে না যাই। তিনি বলেছিলেন, তিনি এটা ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিতে চান।

This article is in Bangla language. It's a translation of the article "The Schoolteacher and the Genocide" by Sarah A. Topol, published in The New York Times Magazine.

Featured Image: New York Times

RB-SM

এক রোহিঙ্গা স্কুলশিক্ষকের ডায়েরি